



Vol. 55 | No. 2 | 2018



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামায় লোকজ উপাদান

Volume	55
Issue	2
Year	2018
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tashrik-E-Habib
Published online	February 1, 2018
DOI	10.62328/sp.v55i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v55i2.5
Pages	৮৩-১২২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামায় লোকজ উপাদান

তাশরিক-ই-হাবিব*

সারসংক্ষেপ : কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) প্রভাববিস্তারী লেখনীর সঙ্গে শুধু সংবেদনশীল, পরিশ্রমী পাঠকেরই নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। তিনি গতানুগতিক, প্রচলিত বিষয়কে বরাবর এড়িয়ে চলেন। তাঁর লেখায় গৃহীত হয় বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়, স্বাজাত্যবোধ, সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই, ইতিহাসের বাঁক-পরিবর্তনকারী ক্রান্তিকালীন রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ ও এর সমন্বিত অভিঘাত, লোকজীবন, মধ্যবিত্ত সমাজের অকৃত্রিম উন্মোচন, মানবমনস্তত্ত্বের গহীন-বিসর্পিল গোলকধাঁধাসদৃশ অন্তর্দর্শকে আবিষ্কার প্রভৃতি বিচিত্র প্রসঙ্গ। এরই ধারাবাহিকতায় খোয়াবনামার অন্তরঙ্গ পাঠগ্রহণসূত্রে আমরা বুঝে উঠতে পারি, এটি প্রকৃতপক্ষে বাংলার নিম্নবিত্ত গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অব্যক্ত কথকতার শিল্পরূপ। মহাকাব্যিক পরিসরে ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজ ও লোকসংস্কৃতি এতে প্রাতিশ্বিক মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যসম্পৃক্ত বগুড়া ও এতদঞ্চলের গ্রামীণ পটভূমিসংলগ্ন কায়িক শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনবাস্তবতা, তাদের অন্তর্গত ভাবনা-আবেগ-সংবেদনশীলতা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি গভীর অনুরাগ এ উপন্যাসের আদ্যন্ত বাজায় রূপ পেয়েছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) মহাকাব্যিক উপন্যাস খোয়াবনামা^১ (১৯৯৬) বিশ শতকের চল্লিশের দশকের ব্যাপ্তিতে তদানীন্তন পূর্ব-বাংলার অন্তর্গত বগুড়ার গ্রামীণ লোকসমাজের অসামান্য কথামালা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, লাহোর প্রস্তাব প্রসঙ্গ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, তেভাগা আন্দোলন, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সংকট প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনার ঘনঘটা এতদঞ্চলের গ্রামীণ জনজীবনে যে ভয়াবহ অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, এরই অসামান্য শৈল্পিক ভাষ্যরূপ এ উপন্যাস। তবে লোকজচেতনার স্বরূপ উপস্থাপনে তিনি এতে ঘটনার স্রোতধারাকে বর্তমান থেকে ক্রমশ অতীতের দিকে ধাবিত করেন ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বৃত্তান্ত সন্নিবেশে।^২ পাশাপাশি বগুড়ার যমুনা নদী সংলগ্ন গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অন্তর্গত^৩ লোকালয়ের বেষ্টনী পেরিয়ে ভৌগোলিক পরিধি সম্প্রসারিত হয় ঢাকা ও কলকাতায়।

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্তির সূত্রে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মর্মান্তিক প্রতিবেদন এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলেও এর কেন্দ্রীয় বলয় জুড়ে রয়েছে^৪ উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের চালচিত্র। মাদারি^৫ ফকির মজনু শাহ ও তার শিষ্য মুনসি বয়তুল্লা শাহের^৬ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ লোকালয়ের বাসিন্দাদের চেতনালোকে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।^৭ এর সাক্ষ্য রয়েছে তাদের অনুসৃত লোকবিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ, লোকসঙ্গীত, গল্প-কিংবদন্তি, লোকভাষা প্রভৃতিতে। কৃষক, জেলে, মাঝি, কলু, মুচি, জোলা, কামার, কুমার প্রভৃতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারার এমন নির্লিপ্ত, অকপট ও বিশ্বস্ত ভাষাচিত্র^৮ বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় নিঃসন্দেহে বিরল। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান যথা লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য, লোকোৎসব, লোকখাদ্য, লোকভাষা প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় প্রযুক্ত হয়েছে।

১. লোকবিশ্বাস- এ উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত বিবিধ লোকবিশ্বাসের রূপায়ণ ঘটেছে। এসব বিশ্বাস তাদের চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয়-পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। গ্রামের লোকসমাজভুক্ত অক্ষরজ্ঞানহীন বাসিন্দাদের নিত্যদিনের বিভিন্ন অভ্যাস, আচার-আচরণ, পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাববিনিময় সবকিছুই এর অন্তর্গত। এসব বিশ্বাস বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে পূর্বপুরুষের অনুসৃত রীতিনীতি ও ঐতিহ্যশ্রয়ী হিসেবে স্বীকৃত। এ উপন্যাসে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামদ্বয়ের অধিবাসীদের মানসলোকে এ ধরনের বিচিত্র লোকবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। এসবের অনেকগুলোই বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত। এক্ষেত্রে কিছু লোকবিশ্বাসের ভিত্তি হলো ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা ও কিংবদন্তি-সম্পৃক্ত চরিত্রসমূহের প্রতি অলৌকিক-অতিলৌকিক গুণ ও শক্তি সম্পর্কিত ধারণা আরোপ। জাতিগত ও ধর্মীয়-সামাজিক পরিচয়ের প্রতি বিমুগ্ধতা লোকসমাজে এ ধরনের বিশ্বাস গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ উপন্যাসে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিংবদন্তি আদ্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে কুশীলবদের গোষ্ঠীচেতনায়। সেকারণেই কাংলাহার বিল, যমুনা নদী, করতোয়া নদী, বাঙাল নদী, মানাস নদী, মোষের দিঘি প্রভৃতি ভৌগোলিক স্থান ও আঞ্চলিক পরিসরের সঙ্গে উক্ত কিংবদন্তির অতি সামান্য এমনকি কখনোবা কোনো ধরনের সম্পর্কহীন অনুষঙ্গও লোকবিশ্বাসের সূত্রে বিভিন্ন ভাষ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফকির মজনু শাহের অনুচর মুনসি বয়তুল্লা শাহের ইংরেজ সেনানায়ক টেলরের বন্ধুকের গুলিতে নিহত হবার বৃত্তান্তের সঙ্গে ইতিহাসের সংযোগ অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মৃত্যুকেন্দ্রিক ঘটনাকে ঘিরে কিংবদন্তির যে ভুবন এ উপন্যাসে বিবৃত, এর মূলে রয়েছে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অনুষঙ্গ এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা লোকবিশ্বাস, যা উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। এরূপ লোকবিশ্বাস হলো, মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন না হলে এবং অপঘাতে মৃত্যু হলে সে অশরীরী, জ্বিন বা প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। উপন্যাসে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বয়তুল্লা শাহের অপমৃত্যুজনিত ঘটনাকে।

পরবর্তী পর্যায়ে কাংলাহার বিলের উত্তর সিথানে অবস্থিত পাকুড়গাছে তার অধিষ্ঠান, এ বিল শাসন এবং বিলসংলগ্ন চারপাশের লোকালয়ের মানুষসহ জল-স্থলের সকল পশুপাখির ওপর তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বিস্তার প্রভৃতি প্রসঙ্গ কিংবদন্তির আকারে দিনের পর দিন পল্লবিত হয়েছে, যার মূলে রয়েছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অকুতোভয় বীর মুনসি বয়তুল্লা শাহের প্রতি তাদের অনুরাগ ও সমর্থন। এক্ষেত্রে তার সম্পর্কিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাস গ্রামে প্রচলিত থাকার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে তাদের রচিত বিভিন্ন লোকসঙ্গীত ও কিংবদন্তি। একারণে লোককবি চেরাগ আলি ও তার সহযোগী তমিজের বাপের প্রতি গ্রামবাসীর সমীহ, দৈব নির্ভরতা গড়ে ওঠে মূলত লোকবিশ্বাসের প্রতি আত্মহবশত। কেননা, প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য লোকমানুষ যে কোনো উপায়কেই অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে মুনসির কিংবদন্তিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত রচনাকারী চেরাগ আলি এবং তার মৃত্যুর পর তার অনুচর তমিজের বাপের প্রতিও তাদের বিশ্বাস স্থাপনের কারণ এটিই। তবে তমিজের বাপের স্বভাবে সন্নিহিত স্বল্পবাকপ্রীতি, বৈষয়িক ব্যাপারে ঔদাসীন্য, আত্মভোলা স্বভাব এবং মনোবিকার তথা ঘুমের মধ্যে রাতের বেলা গ্রামের পথে-প্রান্তরে, বিলের ধারে হেঁটে চলাকে অতিপ্রাকৃত শক্তি হিসেবে গ্রামবাসীর বিবেচনাই এসব লোকবিশ্বাস গড়ে তুলেছে। কুলসুম স্বামী সম্পর্কে ভাবে, “ঘুমন্ত মানুষ কথা বলে মুনসির সাথে, না হলে জিন পরীর সাথে, মাসুম বাচ্চাদের আলাপ হয় ফেরেশতাদের সাথে। আগুনের জীবদের সাথে তমিজের বাপের কি যোগাযোগ হয় না? দাদা বলতো, ‘মানুষটাক আবার ঠেকলে কী হয়, জাহেল মাঝির বেটা হলে কী হয়, অর মদ্যে বাতেনি এলেম থাকবার পারে রে! মানুষটার মদ্যে আগুন জ্বলে!’” (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৪২)। তমিজের বাপ স্বভাবে উদাসীন হলেও যে কাজে সে হাত দেয়, সেই কাজেই সাফল্য নিশ্চিত, এমনটিও গ্রামবাসীর ধারণা। অবশ্য এটি ক্রমশই যে সমষ্টিমানুষের বিশ্বাসে উন্নীত, এর বিবিধ দৃষ্টান্ত উপন্যাসে রয়েছে। কাংলাহার বিলে বা বাঙাল-মানাস-যমুনা নদীতে জাল ফেললেই তার জালে বিরাটাকৃতির বুই, এমনকি এক মণ-সোয়া মণ ওজনের বাঘাড় মাছ ওঠে। সে একাই ধানী জমিতে তিনজন কামলার কাজ করে। সেকারণেই গ্রামবাসীর বদ্ধমূল বিশ্বাস, তার ওপর মুনসির বিশেষ নজর রয়েছে। নতুবা এমনটি কোনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কুলসুম ভাবে, ‘তমিজের বাপ তো যি সি মানুষ লয় বাপু! ঘুমের মধ্যে সে কার ডাকে বাইরে চলে যায়, কতোদূর যায়, কেউ জানে না। তমিজের বাপকে নিয়ে মানুষ কতো কথাই না বলে! এমনিতে টোপ পাড়লে কী হবে, কামে গেলে তার জুড়ি নাই। ... তমিজের বাপের শক্তি আসে পাকুড়গাছ থেকে। কতো মানুষ তাকে নিয়ে কতো কথা কয়’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৪৭)। ইতিহাসের পাতায় ভর করে অতীতদিনের বৃত্তান্ত তমিজের বাপের মনোলোকে পরাবাস্তব আবহযোগে যেভাবে মূর্তময় হয়ে ওঠে, তাতে অনুধাবন করা যায়, গ্রামদ্বয়ের বাসিন্দাদের চেতনালোকে মুনসি সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসের প্রভাব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত—

মণ্ডল যদি পাকুড়গাছ পর্যন্ত লাঙল চালায় তো কী হবে? সবটাই মণ্ডলের দখলে গেলে মুনসির পোষা গজার মাছগুলো হয়তো নতুন ওঠা মাটির তলায় কেঁচো হয়ে কিলবিল করবে। না-কি সেগুলোকে ভেড়ার আকার দিতে না পেরে মুনসি তাদের লোহার আংটা করে গড়িয়ে নিয়ে গাঁথে রাখবে নিজের গলার শেকলে? অতো সোজা নয়!—চেরাগ আলি বলে গেছে, চেরাগ আলির বুহে ভর করে মুনসিই জানিয়ে গেছে, গজারগুলোকে কেউ উৎপাত করলে এই দুনিয়ার ভাত তার চিরকালের জন্য উঠে যাবে। ... কিন্তু ফকির নাই, মুনসির হুকুম আসবে কার মুখ দিয়ে? ... জোতদারদের সঙ্গে লাঠালাঠি করা বর্গাচাষাদের রক্তে পিছলা জমির আল পেরোতে পেরোতে মুনসির গান কমজোর হয়ে গড়িয়ে পড়ে কাৎলাহার বিলে। বিলের পানিতে হাবুডুবু খেয়ে উঠে এই গিরিরডাঙায় আসতে আসতে গান ঝাপসা হয়ে পড়ে। বৃষ্টিভেজা তারার আলোয় তমিজের বাপের বাড়ির খুলিতে তার ছায়া পড়ে। এই ছায়া ছায়া আলোয় ঐ গান এসেছে কার গলায় সওয়ারি হয়ে? ভালো করে খেয়াল করলে ছায়াটিকে পাকুড়তলার সাদা ঘোড়া বলে ঠাহর করা যায়। সারা অঙ্গে তার দুষমনের তীর বেঁধা, সওয়ারি নেওয়ার জন্য অস্থির সাদা ঘোড়ার গায়ের তীরের ডগাগুলো তিরতির করে কাঁপে। অতো অতো তীরের মধ্যে মুনসি বসবে কোথায় তা ভালো করে বুঝতে না বুঝতে ঘোড়া ছুটতে শুরু করে। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৮৭)

মৃতব্যক্তি মৃত্যুবরণের পরও তার প্রিয়জনের নিকট আসে, এ ধরনের বিশ্বাসও গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত। এ উপন্যাসের ‘২২’ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, চেরাগ আলি ফকির মৃত্যুবরণ করলেও সে যে কখনো কখনো তার নাতি কুলসুম এবং নাতজামাই তমিজের বাপের ওপর ভর করে, এ ধরনের লোকবিশ্বাস বৈকুণ্ঠের সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে। হরমতুল্লার বড় মেয়ে ফুলজানের জামাই এবং লোককবি কেরামত আলির সঙ্গে জীবদ্দশায় চেরাগ আলি ফকিরের পরিচয় ঘটেছিল খিয়ার এলাকায় তখা নাটোর ও এ সংলগ্ন স্থানে। সেদিকে তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব দিনদিন ছড়িয়ে পড়ছিল। কেরামত আলি চেরাগ আলির সঙ্গীত রচনার ধরন এবং এর বিষয়বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিল। সঙ্গীতের প্রতি চেরাগ আলির আন্তরিকতা সম্পর্কে তার ধারণা সে সময়েই গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে সে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসে এবং বৈকুণ্ঠের মাধ্যমে চেরাগ আলির নাতি কুলসুম ও নাতজামাই তমিজের বাপের সঙ্গে পরিচিত হয়। কুলসুম তার দাদার কাছ থেকে শোনা ‘মাদারি ফকির’ বিষয়ক গানগুলো শুনে শুনে মুগ্ধ হয়েছিল এবং একমনে সুর করে গাইত। একদিন সে যখন তাদের সামনে এ গান পরিবেশন করে, তাদের বিশ্বাস জাগে, কুলসুমের ওপর চেরাগ আলিই ভর করেছে—

বটতলায় বৈকুণ্ঠের সঙ্গে চিড়াগুড় খেতে খেতেও কেরামতের ভয় কাটে না। আস্তে আস্তে বলে, ‘ফকির মনে হয় কাল নাতনির ওপর আসর করিছিলো।’ সে নিশ্চিত, কুলসুম কিছুতেই ওই গলায় গাইতে পারে না। চেরাগ আলির গলা মোটা এবং একটু বুখা, মাঝে মাঝে কর্কশও বটে। ... কুলসুমের গলা তো রীতিমতো মিষ্টি, তার পক্ষে

কি ‘গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়’ গাইবার সময় শ্রোতাকে ওইভাবে ধমক দেওয়া সম্ভব-চেরাগ আলি নির্ঘাত কাল ভর করেছিলো কুলসুমের ওপর। ... কিন্তু কেরামতের ধারণা নস্যাত করে দেয় বৈকুণ্ঠ, একটু রাগ করেই সে বলে, ‘ইগলান কী কথা কও? আসর করবি কিসক? মাচার উপরে ফকিরেক হামরা দেখনু না? ফকির না আসলে দোতারা বাজালো কেটা? ... হামার চোখ এখনো লষ্ট হয় নাই, বুঝালা? ... হামি বলে লিজের চোখে দেখনু, মাচার উপরে খ্যাতা মুড়ি দিয়া বস্যা মাথা ঝুঁকায়া ঝুঁকায়া ফকির গান করিছে। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪৮৬-৪৮৭)

পাকুড় গাছ মুনসির আরশ, এমন বিশ্বাস গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার বাসিন্দাদের মধ্যে বহুদিন ধরে প্রচলিত। কিন্তু শরাফত মণ্ডলের বড় ছেলে আবদুল আজিজ কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানের গাছপালা কেটে ফেলায় সেটিও সবার অগোচরে কাটা পড়ে। সেকারণেই সেখানে উপস্থিত হয়ে তমিজের বাপ পাকুড় গাছের দেখা না পেলে এ ঘটনা জানাজানি হয়। ফলে গ্রামবাসীর মনে এ বিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে, মুনসির ক্রোধ তাদের ওপর অচিরেই বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হবে। শুধু অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামবাসীই নয়, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, শহরে চাকরিজীবী আবদুল আজিজও তার পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য এ ঘটনাকে দায়ী করে- ‘আবদুল আজিজও এসে বড়ো উদ্ভিগ্ন হয়। মুনসির আসন যদি তারা কেটে থাকে তো সেটা ভালো কথা নয়। তার বেটা মরল আর বছর, এ বছর তার সম্বন্ধী হলো খুন। খঞ্জনদিঘির পীরসাহেবের হিসাব মতো আহসান যদি কলকাতায় কোনো ঘরে বন্দি হয়ে থাকে তো এই মুনসির বদদোয়াতেই এখন মারা পড়বে হামিদার স্বপ্নে দেখা সেই সিঁদুর মাখা খাঁড়ার ঘায়ে। হামিদা আজকাল যা শুরু করেছে, এই পাকুড়গাছ সরে যাওয়ার কারণেই সে আবার বন্ধ উন্মাদ হয়ে না পড়ে’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫৭৪)।

এ উপন্যাসে লোকবিশ্বাসের ভিন্নতর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কুলসুমের মনস্তত্ত্বে। তার মনোবিকৃতির মূলে রয়েছে মৃত ব্যক্তির জীবিত প্রিয়জনের ওপর ভর করে ফিরে আসা সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস। বৃদ্ধ স্বামী তমিজের বাপের প্রতি তার প্রণয়সিক্ত ভালোবাসার প্রকাশ দাম্পত্যজীবনে পরিলক্ষিত হয়নি। তবু যুবতী এ নারী তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। কিশোরী বয়সে তার সঙ্গে তমিজের বাপের বিয়ে হয়। সন্তানহীন কুলসুমের সাংসারিক হালচাল ছিল গ্রামের সাধারণ আর দশটি পরিবারের গৃহবধূর মতোই। আকস্মিকভাবে কাৎলাহার বিলসংলগ্ন চোরাবালিতে গভীর রাতের অন্ধকারে পড়ে গিয়ে তমিজের বাপ মৃত্যুবরণ করে। এরপর থেকে কুলসুমের মনোলোকে তমিজের বাপ নতুনরূপে আবির্ভূত হয় তার কল্পনায়, অলীক প্রত্যক্ষণে। পুরো ব্যাপারটিই তার মনোবিকারগ্রস্ততা তথা সিজোফ্রেনিয়ার নির্দেশক। তমিজের বাপের মৃত্যুর পরপর কুলসুম তমিজের মধ্যে তার বাপকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিল। কিন্তু একপর্যায়ে তমিজের আকস্মিক পিতৃবিয়োগজনিত ঘোর কেটে গেলে তাকে কুলসুম জানায়, তার স্বপ্নে তমিজের বাপ প্রায়ই আসে। অচিরেই কুলসুমের মানসিক অবস্থার আরো অবনতি হলে সে তমিজকে জানায়, তমিজের বাপ প্রতি রাতেই তার ঘরে আসে।

তমিজ কুলসুমের অন্ধকার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তার আলাপ শুনে একপর্যায়ে ভীত হয়। অশরীরীরা আলো সহ্য করতে পারে না, অন্ধকার তাদের পছন্দ, এ লোকবিশ্বাসেরই রূপায়ণ ঘটেছে উক্ত ঘটনায়। অবশেষে কালাম মাঝি ও কেরামত আলি, উভয়েই কুলসুমের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করলেও তমিজের বাপের উপস্থিতি সম্পর্কিত কুলসুমের বয়ান তাদেরকে বিভ্রান্ত করে তোলে। এর জের ধরে কালাম মাঝি কুলসুমকে হত্যার দায়ে কেরামত আলিকে ফাঁসায়। এছাড়াও এ উপন্যাসের ‘৪’ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, তমিজের বাপ সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময় ছেলের ডাকে চমকে যায়। কেননা, আগের সন্ধ্যায় মাঝিপাড়ার কিশোর বুলুর মৃত্যুর পর সে তাকে কবর দেয়ার কাজে গোরস্তানে ব্যস্ত ছিল। এরপর প্রবল ক্রান্তিবশত বাড়ি ফিরেই তমিজের বাপ ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সে বাড়ি ফেরার পথে গোরস্তানের খেজুর গাছের ডাল সঙ্গে আনে। কারণ, ‘গোরস্তানের খেজুর ডালের গুণ অনেক, এটা সঙ্গে থাকলে রাত্রে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না, এর শক্তি আগুন ও লোহার পরেই। রাতে কাৎলাহার বিলের সিথানে পাকুড়তলায় যাবার সময় এটা সঙ্গে রাখা ভালো’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৬২)। লোকবিশ্বাস যে ব্যক্তির মনোলোকে বিশেষ ভূমিকা রাখে, তা প্রতীয়মান হয় নিচের দৃষ্টান্তে—

টাউনের কালীবাড়ির জবাফুল ধোয়া মায়ের পাদোদক ভক্তি করে খেতে পারলে মরা মানুষও লাফ দিয়ে ওঠে। ফুলজানের বেটার কিছু হলো না। হবে কী করে?— সব নষ্ট করলো ওই শালা কলুর বেটা গফুর। গোলাবাড়ি হাটে একদিন হরমতুল্লাকে সে শুনিয়ে দিয়েছে, ‘মাঝির বেটা তোমার বেটির পয়সা আর ফেরত দিচ্ছে! আবার হিন্দুর ঠাকুরের পানি লিয়া আসিছে? আরে, হিন্দুর ঠাকুর, তাঁই মোসলমানের বালামুসিবত আসার করবি কিসক?’ এটা শুনে ফুলজানের মনটা বিষিয়ে উঠেছে, পাদোদকে তার আর ভক্তি রইলো না। বেটার ব্যারাম সারে কী করে? (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪১৪)

কোনো ব্যক্তি কাজে সাফল্য অর্জন করলে ধরে নেয়া হয় দৈবী শক্তি তার প্রতি সহায় ছিল। এরূপ বিশ্বাস বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে বহুল প্রচলিত। ‘১৩’ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মাঝির ছেলে হয়েও তমিজ শরাফত মণ্ডলের বর্গাচাষের ধানী জমিতে কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে সমর্থ হলে তা দেখে “আলের ওপর দাঁড়িয়ে শমশের পরামাণিক সেদিন আর চোখ ফেরাতে পারে না। খুশিতে সে ডগমগ, ‘মাঝির বেটা, তুই কী করিছ রে? তোর হাতের বরকত আছে বাপু’” (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪১৩)। এছাড়া, নতুন ধান ঘরে তোলার পর তা গুড়ো করে যত দ্রুত সম্ভব পিঠা ও অন্যান্য খাবার তৈরি করে পাড়া-প্রতিবেশী, স্বজনদের পরিবেশন করার লোকবিশ্বাসও গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত। তাই ‘২০’ পরিচ্ছেদে তমিজ নিজের ভাগের ধান ঘরে আনলে তা দেখামাত্রই উল্লসিত কুলসুম জানায়, ‘কালাম চাচার ঢেঁকিত যাই। আজই তোমাগোরে পিঠা খাওয়ামু। ধান ঘরত তুল্যাই পিঠা খির না হলে ওই ধান বরকত দিবি না গো।’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪৬৯)

২. লোকসংস্কার- গ্রামীণ লোকমনস্তত্ত্ব অনুধাবনে লেখকের পারদর্শিতার দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসের আদ্যন্ত লক্ষণীয়। লোকসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামদ্বয়ের বাসিন্দাদের আচরণ, চালচলন ও ব্যবহারের যে স্বকীয় পরিচয় অকপটে ফুটে ওঠে, তা থেকে তাদের সমষ্টিচেতনার স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের অভ্যাস, জীবনধারণের বিশিষ্ট রীতি, ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতির ওপর লোকসংস্কারের প্রভাব অনস্বীকার্য। এমনকি তাদের ভাষিক পরিমণ্ডলেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্বপ্ন^{১০} সম্পর্কে গ্রামীণ লোকসমাজের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি এ উপন্যাসে দীর্ঘ পরিসরে ভাষ্যরূপ পেয়েছে। উপন্যাসের নামকরণের সঙ্গে এর রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা, যদিও তা বহুলাংশেই রাজনৈতিক প্রসঙ্গসংলগ্ন, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তদানীন্তন পূর্ব-বাংলার বাসিন্দাদের ধর্মীয় পরিচয় ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা। নিঃসন্দেহে এ উপন্যাসে লোকসংস্কারের বিভিন্ন অনুষ্ণের মধ্যে স্বপ্ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জোরালো ভূমিকা রেখেছে। চিন্তা-চেতনায় পশ্চাৎপদ, দৈবনির্ভর, প্রকৃতিসংলগ্ন লোকগোষ্ঠীর বাসিন্দাদের নিকট স্বপ্ন ব্যাখ্যাতে এমন এক প্রসঙ্গ, যাকে কোনোভাবেই এড়িয়ে চলা যায় না। বরং তারা স্বপ্নে যা দেখে, এর সঙ্গে নিজেদের জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনাকে যুক্ত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নের অর্থ যেহেতু রহস্যবৃত, ধোঁয়াশাচ্ছন্ন, রূপক ও প্রতীকী অর্থ আরোপের মাধ্যমে এর বোধগম্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তাই প্রায়শই লোকমানুষের নিকট এটি হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তার বিষয়। একারণেই ব্যক্তির মনোলোকে সন্নিহিত আবেগ, সংবেদনা, কামনা-বাসনা, ভয়, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, কোনো দুঃসহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি, শারীরিক যন্ত্রণা বা অসুস্থতা এবং বাস্তব জীবনে নিত্যদিন ঘটে চলা অজস্র ঘটনা ও এর প্রতিক্রিয়া মিলেমিশে ব্যক্তির অবচেতনলোকে যে ছাপ ফেলে, সেটির মর্মার্থ অনুধাবন জটিল হয়ে পড়ে। এ উপন্যাসে স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী হিসেবে চেরাগ আলির অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা এমনকি তার নিজ গ্রাম মাদারিপাড়া ও যমুনার তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে আস্থা অটুট। ফকিরালির অংশ হিসেবেই চেরাগ আলি অর্থের বিনিময়ে স্বপ্ন দর্শনকারীর নিকট এর বোধগম্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। এ কাজে সে অনুসরণ করে জরাজীর্ণ একটি খোয়াবনামাকে, যার প্রতি গ্রামবাসীর অসীম কৌতূহল এবং অতিপ্রাকৃতিক শক্তিজনিত বিশ্বাস রয়েছে। কেরামত আলির দৃষ্টিকোণ থেকে এ খোয়াবনামার বিবরণ উপন্যাসের ‘৩১’ পরিচ্ছেদে বিবৃত-

বইয়ের পাতা উল্টায় আর কেরামত আলি দেখে, কোনো কোনো শোলোকই নাই। খাকি রঙের কাগজে বইয়ের মলাট সেলাই করা, সেখানে কার কাঁচা হাতের লেখা, ‘খাবনামা ফালনামা ও তাবির।’ ... এটার ভেতরে ছাপা কোনো পাতা নাই। অর্ধেকের বেশি পাতা জুড়ে চৌকোণা চৌকোণা দাগ, সেইসব বর্গক্ষেত্রও আবার করা হয়েছে ছোটো ছোটো ঘরে। একেকটি ঘরে একেকটি আরবি অক্ষর। নাপাক শরীরে

আরবি লেখা ছুঁয়ে ফেলায় কেরামতের একটু একটু ভয় করে, কিন্তু এখন অজু করতে গেলে বইটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। সে আস্তে আস্তে পাতা ওল্টায়, জীর্ণ পাতা, ধরতে হয় সাবধানে, একটু এদিক ওদিক হলেই পাতা ছিঁড়ে যাবে। এরপর গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে নানারকমের খোয়াবের বিবরণ। কোন খোয়াব দেখলে কী হতে পারে, এর ফলাফল কী, খোয়াবের তাবির-সব বুঝিয়ে বলা। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫৪৯)

গ্রামবাসী স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন দেখে চেরাগ আলির নিকট এর অর্থ জানতে ও পরামর্শের জন্য এলে সে সেই বিবরণ শুনতে শুনতে খোয়াবনামার পাতা উল্টে মাটিতে অজস্র রেখা কেটে এর ব্যাখ্যা দেয়ার পাশাপাশি করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিত। আবার অর্থসংকটে পড়লে দোতারা নিয়ে সে গোলাবাড়ির হাটে গান পরিবেশনের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নানা রঙের তালিমারা ঝোলা থেকে খোয়াবনামা বের করে তাদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তা ব্যাখ্যা করত। বাজারের প্রচলিত খোয়াবনামার ইঙ্গিতের সঙ্গে তার ব্যাখ্যার কোনো মিল ছিল না। স্বপ্ন দর্শনকারী কখন স্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্নে কী দেখেছে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আনুষঙ্গিক তথ্যাদি কিছুটা জেনে বা না জেনেই সে অভিমত জানাত –

খোয়াবে খারাপ কিছু দেখলেই চেরাগ আলির কাছে ছুটে এসেছে মানুষ, ‘ও ফকির, কও তো, পাছারাতে দেখলাম, হামাগোরে কুয়ার পানি ক্যামা গরম ঠেকিছে। বালটি দিয়া তুল্যা গাও ধোমো, পিঠোত পানি ঢালিছি, তামান পিঠ বলে পুড়্যা গেলো রে। এই খাবের মাজেজা কী, কও তো বাপু।’ ঝোলা থেকে একমাত্র বইটা বার করে চেরাগ আলি আস্তে আস্তে পাতা ওলটাতো। প্রতিটি পৃষ্ঠা ওলটাবার সঙ্গে জিভে আঙুল ছুঁয়ে বলতো, ‘স্বপন তুমি কখন দেখিছো কও তো বাপু।’ ঠিক লগ্নটি বলতে বলতে স্বপ্ন-দেখা মানুষটা আমতা আমতা করলে তাকে করা হতো পরবর্তী প্রশ্ন, ‘পাছারাতোত তুমি শুছিলা কোন কাত হয়?’ পাশে বই রেখে বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই ঘরের সামনে ছোটো উঠানে কাঠি দিয়ে চৌকো চৌকো দাগ দিতে দিতে সে একরকম প্রশ্ন করেই যেত এবং পঁচিশটা প্রশ্ন করে তার অর্ধেকেরও জবাব না পেয়েও স্বপ্নের মাজেজা বলে দিতো। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৫৩)

বছরের অন্য সময় এ পেশায় চেরাগ আলির অর্থসংকট কিছুটা লাঘব হলেও বর্ষাকালে তাকে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, এ সময়ে ছাপরা ঘরের বাইরে গিয়ে ফকিরালি চালানো সম্ভব নয়। আবার অভাবের কারণে ভাদ্র মাসে আউশ ধান কাটার পূর্ব পর্যন্ত গ্রামবাসী ভিক্ষা দিতে চায় না। অনটনের দিনে মানুষ স্বপ্নের অর্থ জানতে তার কাছে আসে না। তবে নতুন ধান ঘরে ঘরে উঠলে এ পরিস্থিতি বদলে যায়। সে যে নিতান্তই জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে বিপদগ্রস্ত, সংকটাপন্ন ব্যক্তির দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়, তা তার নাতনি কুলসুম বেশ ভালোই জানত। এমনকি, এক পর্যায়ে কেরামতও বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল। তবে সে

ভাবত, মুনসির অনুচর হিসেবে চেরাগ আলি অতিপ্রাকৃত শক্তির গুণে মানুষের ভূত-ভবিষ্যত গণনা করতে সমর্থ। চেরাগ আলি বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল। যেমন- কাজলের স্বপ্ন দেখলে ছেলেমেয়ে বাপমায়ের আশা পূর্ণ করে (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৪২)। কুয়ার পানি স্বপ্নে গরম অবস্থায় থাকলে নাকি তার ভাগ্যে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। ‘খোয়াবে কেউ একটা গোরু দেখলো, গরুটা মোটাতাজা হলে তার মানে এক রকম, আবার রোগা হলে মানে অন্য রকম। গোরু জবাই হতে দেখলে তাবির পাল্টে যাবে। স্বপ্নে কাউকে কুকুর তাড়া করেছিলো শুনে চেরাগ আলি হাসতো, লোকটার শত্রু জন্ম হবে। আবার শুধু কুকুর দেখা মানে কঠিন বিপদের আলামত’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৮২)। যমুনা নদীর প্রবল ভাঙনের তোড়ে মাদারিপাড়া যখন নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম, এক রাতে চেরাগ আলির জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলে সামাদ ফকির ভোররাতের স্বপ্নে যমুনার ঘোলা পানিতে নিজের ডুবে যাবার স্বপ্ন দেখে। চেরাগ আলি এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাকে জানায়, পানিতে ডুবে যাবার স্বপ্ন দেখার অর্থ খুব খারাপ। এ স্বপ্ন রোগের ইশারা নির্দেশক। এমনকি স্বপ্নদর্শনকারীর অন্যান্য বিপদ, কারাবাস ঘটবারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। বৈকুণ্ঠ চেরাগ আলিকে গভীর রাতে দেখা স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানায়। সে সকাল দশটা-এগারোটার দিকে মশারির ভেতরে বা বাইরে বসা অবস্থায় খই খাওয়ার ঘটনা বললে চেরাগ আলি ধৈর্যসহকারে তা শুনে জানায় -

খই খাবার স্বপ্নে বৈকুণ্ঠের ধনদৌলত রোজগারের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো, একই স্বপ্নে মশারির ভেতর ঢুকে বৈকুণ্ঠ তার বিনাশ তো ঘটিয়েছেই, এমন কি বেশ সংকটেই পড়েছে। ... মশারির স্বপ্ন আসলে কবরের ইশারা, - কথাটা বলতে বাধো বাধো ঠেকছিল চেরাগ আলির। এটা সে সরাসরি জানায় কেবল তমিজের বাপকে, তাও তিন দিন পর গোলাবাড়ি হাটে। ওখানেই বৈকুণ্ঠকে ডেকে ফকির শুধু বললো, ‘বৈকুণ্ঠ তোর খোয়াবের মাজেজা ভালো লয় রে! পাঁচ আনা পয়সা মুনসির নামে মানত দেওয়া লাগবি।’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৯০-৩৯১)

চেরাগ আলির খোয়াব বা স্বপ্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা তার নাতনি কুলসুম ও নাতজামাই তমিজের বাপকেও প্রভাবিত করেছিল। তারাও চেরাগ আলির মৃত্যুর পর কখনো কখনো এ কাজ করত, নগদ অর্থের বিনিময়ে। বৈকুণ্ঠ তমিজের বাপের কাছে ইদুরের ধান খাওয়ার স্বপ্ন দেখার কথা জানালে কুলসুম তা শুনে প্রত্যুত্তরে বলেছিল-

ইন্দুরে খাইলো ধান বড়ো কুফা বাত।

জানিয়া রাখিও বান্দার কমিলো হায়াৎ ॥ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫৬১)

তবে এ উপন্যাসে ব্যক্তির স্বপ্নদর্শনকেন্দ্রিক মনোজটিলতার পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে শরাফত মণ্ডলের বড় ছেলে আবদুল আজিজের স্ত্রী হামিদার মাধ্যমে। তার একমাত্র ছেলে হুমায়ুন দুই দিন ধরে প্রবল জ্বরে ভুগলে রাত জেগে হামিদা তার সেবা করতে করতে ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর সে স্বপ্নে লোবানের গন্ধ পায়। স্বাভাবিকভাবেই ছেলের মৃত্যুর আশঙ্কায় সে ভীত হলে তার সামনে সাদা ধবধবে

কাপড়পড়া, গলায় শেকলজড়ানো ঘোলাটে লাল চোখের অধিকারী কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা একজন মানুষ হাজির হয়। হামিদার ধারণা হয়, সে আগন্তুককে ইতঃপূর্বে কোথাও দেখেছে। খসখসে কণ্ঠে সে হামিদাকে বলে, ‘আর কদিন? বেটাকে এখন আরাম দে, আরাম দে!’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪৩৬)। হামিদার নাকে লোবানের গন্ধ তীব্রতর হতে থাকলে হঠাৎ লোকটির দিকে তাকিয়ে সে বুঝে ওঠে, তার পরনে কাফনের কাপড় জড়ানো, যেটিতে মাটি লেগে রয়েছে। তখন আকস্মিকভাবেই হারিকেন নিভে গেলে লোকটি গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে অন্তর্হিত হয়। সেই মুহূর্তে হামিদার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। পরদিন তার নিকট থেকে এ বৃত্তান্ত শুনে শরাফত মণ্ডলের ছোট স্ত্রী ধারণা করে, চেরাগ আলিই নিরুদ্দেশ অবস্থায় এভাবে হামিদার স্বপ্নে দেখা দিয়ে হুমায়ুনকে মৃত্যুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এ স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানতে আবদুল আজিজ তমিজের বাপের দ্বারস্থ হলেও সে এ ব্যাপারে গরজ দেখায়নি। ফলে কুলসুমকেই এ কাজে এগিয়ে আসতে হয়। সে হামিদার কাছে গিয়ে তার পূর্বরাতে দেখা স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে এবং চেরাগ আলি পরিবেশিত গানের সঙ্গে নিজের পরিবেশিত গান মিলিয়ে এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হলেও হুমায়ুনের মৃত্যু ঘটায় এর প্রতিকার সম্ভব হয় না। তবে হুমায়ুনের চল্লিশার দিন গ্রামবাসীর আহ্বারের আয়োজনে তমিজের বাপকে দাওয়াত খেতে দেখে হামিদা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায় এবং তার স্বামী ও মাকে জানায়, সে-ই নাকি হুমায়ুনের মৃত্যুর পূর্বরাতে হামিদার স্বপ্নে হাজির হয়ে তার ছেলেকে নিয়ে গেছে। তমিজের বাপ সম্পর্কে গ্রামবাসীর ভাবনায় অতিপ্রাকৃত শক্তি, তার পূর্বপুরুষ তথা দাদা বাঘাড় মাঝির কেরামতির পাশাপাশি ভীতিবোধও এসব ঘটনায় পল্লবিত হতে থাকে। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন শরাফত মণ্ডল ও আবদুল আজিজ বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যাকালে নির্জন গোরস্তানসংলগ্ন বাঁশঝাড়ে তমিজের বাপকে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ‘তমিজের বাপ কি আসলেই তমিজের বাপ? লোকটা কে? – ভয়ে আবদুল আজিজ থরথর করে কাঁপে’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪৪৬)।

হামিদার স্বপ্নদর্শনকেন্দ্রিক জটিলতা ছেলে হুমায়ুনের মৃত্যুর পর নতুন মাত্রা পায় কলকাতায় ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তার বড়ভাই আহসানের হিন্দু উগ্রপন্থীদের ছুরির আঘাতে নিহত হওয়ার ঘটনায়। আবদুল আজিজ এ ঘটনার সময় তার সঙ্গে থাকলেও কিছুই করতে পারেনি। কেননা, চারপাশের বিক্ষুব্ধ পরিবেশে প্রাণের ভয়ে তখন সকলেই বিপন্ন অবস্থায় ছুটছিল নিজেকে বাঁচাতে। সে বাড়ি পৌঁছেই তমিজের বাপকে খবর পাঠায় আহসানের মৃত্যু সম্পর্কে হামিদার অবিশ্বাসের প্রতিকার করতে। কেননা, তার ধারণা, আহসান মারা যায়নি। ‘হিন্দুরা তাকে হয়তো কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, কিংবা সে পালাতে গিয়ে আটকা পড়েছে কোথাও’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫৬৩)। এমতাবস্থায় তমিজের বাপকে দিয়ে আহসানের ভবিষ্যত গণনার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু তমিজের বাপ নিতান্তই খামখেয়ালিবশত এ প্রস্তাবে অনগ্রহ প্রকাশ করলে হামিদা জানায়, ‘কয়েকদিন ধরে বাড়ির পশ্চিমদিকে খালি কাক ডাকে, খালি কাক ডাকে। তখনই তার মনে হয়েছে, কোথাও কী সর্বনাশ হচ্ছে। কিন্তু মিয়াভায়ের কথাটা

তার একবারো মনে হয় নি। তবে তার মিয়াভাই নামাজরোজা করা মানুষ, সে অপঘাতে কখনোই মরতে পারে না। ... তমিজের বাপ তো দুনিয়ার আর আখেরাতের অনেক কথা জানে। সে কি একটু গোনাগাথা করে মিয়াভাইয়ের এখনকার অবস্থাটা বলে দিতে পারে না?’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫৬৪)। তমিজের বাপ অমাবস্যার পূর্বে এ ব্যাপারে কিছু বলতে আপত্তি জানায়। কেননা, অমাবস্যার রাতে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়তলায় মুনসির দেখা পাওয়ার সম্ভাবনাটা বাড়ে। স্ত্রীকে সাজনা দিতে আবদুল আজিজ একপর্যায়ে খঞ্জনদিঘির ফকিরের দ্বারস্থ হয়ে শোনে, আহসান মারা যায়নি। দক্ষিণের (কলকাতার) কোনো বড় শহরে ছোটো গলির একটি ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। এর ফলে হামিদার মধ্যে এ বিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে, আহসান জীবিত রয়েছে। তার মনোবিকারও এসব ঘটনার সূত্রেই বাড়তে থাকে। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পরবর্তী পনের দিনে অন্তত একবার করে হলেও এ দুঃস্বপ্ন দেখার ঘটনায় – ‘মোটাসোটা কয়েকটা টিকিওয়ালা লোক খালি গায়ে খাটো ধুতি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আহসানকে ঘিরে, তাদের সর্দারের কপালে লাল চন্দন লাগানো, হাতে সিঁদুর লাগানো খাঁড়া। খাঁড়াটা ঝুলছে আহসানের মাথার ওপরে, তার কোপ নিচে পড়তে শুরু করতেই, আহসানের গলায় কি মাথায় ঘা পড়ার আগেই হামিদার ঘুম ভেঙে যায়’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫৬৮)। সে এরপর অসংলগ্নভাবে চিৎকার ও কান্নাকাটি করতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে সে দুঃস্বপ্নে আহসানের মুখের সঙ্গে হুমায়ূনের মুখের মিল আবিষ্কার করে এবং সিদ্ধান্তে স্থিত হয়, ‘মামা ভাগ্নে এক সঙ্গে, এমন কি একই শরীরে থাকলে সিঁদুরমাখা খাড়াটা হয়তো ঠেকাতে পারবে’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫৬৯)। জাহ্নত অবস্থায় মৃত ছেলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সে কখনো বাড়ির সকলের চোখের আড়াল হয়ে গোরস্থানে যাবার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেলে তার ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। খেয়ালের বশে কখনো কখনো শীতের সন্ধ্যাতেও বহুক্ষণ ধরে সে গোসল করে। রাতের খাবার না খেয়েই হামিদা শুয়ে পড়ে, ঘুমের ভেতর ভাই আর মৃত ছেলের খোঁজ জানতে। হামিদার অপ্রকৃতিস্থ আচরণ দিনদিন বেড়ে যাওয়ায় বাড়ির মানুষ তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গ্রামে এসব ঘটনা কানকথা, রটনার মাধ্যমে কদর্য রূপে পরিবেশিত হয় মানুষের মুখে মুখে। এ উপন্যাসের ‘৪৫’ পরিচ্ছেদে হামিদাকে শেষবারের মতো উপস্থিত হতে দেখা যায় সম্পূর্ণ উন্মাদ রূপে। দেশবিভাগের পর আবদুল আজিজ কলকাতায় নতুন বাড়ি কিনলে সেখানে অবস্থানরত হামিদা মৃত ছেলে ও ভাইয়ের শোকে মেহমানদের সামনে অসংলগ্ন আচরণ করে। এভাবেই এ উপন্যাসে হামিদার মনোবিকৃতিতে স্বপ্ন সম্পর্কিত বৃত্তান্ত রূপায়িত হয়েছে। তবে, তমিজের বাপ বা চেরাগ আলি সম্পর্কিত হামিদার বিভিন্ন স্বপ্ন দেখার ভিত্তিভূমি নিঃসন্দেহে মুনসি বয়তুল্লা শাহ সম্পর্কিত কিংবদন্তি। লোকমুখে বহুদিন ধরে প্রচলিত এসব কাহিনীর সঙ্গে চেরাগ আলি ও তমিজের বাপের সম্পর্কিত নানা ঘটনা ও বৃত্তান্ত মিলেমিশে হামিদার মনোলোকে যে বিভ্রম সৃষ্টি করেছিল, এরই ধারাবাহিকতায় সে ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহের রূপায়ণে লেখক বিশেষ কৌশলে লোকমানসে সন্নিহিত স্বপ্ন সম্পর্কিত বিবিধ লোকসংস্কারকে গ্রন্থিত করেছেন।

নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক পরিচয় যে আর্থ-সামাজিক গ্রামীণ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র ভূমিকা পালনে তাদের উদ্ধৃদ্ধ করে, এর দৃষ্টান্তও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে লোকসংস্কারের জোরালো ভূমিকা অনস্বীকার্য। উপন্যাসের ‘২’ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, তমিজের বাপের সঙ্গে তার দ্বিতীয় স্ত্রী কুলসুমের বয়সের বিশাল ব্যবধান রয়েছে। কুলসুম তার সৎছেলে তমিজেরই বয়সী। দাম্পত্যজীবনে তমিজের বাপের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার পরিচয় সমগ্র উপন্যাসেই অনুপস্থিত। নিছক আশ্রয় লাভ এবং ভরণপোষণের প্রয়োজনেই সম্ভবত, সে এ বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। তমিজের বাপের কুলসুমকে ‘তুই’ সম্বোধন, কোনো কারণে রেগে গেলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং শারীরিক প্রহার প্রভৃতি এদেশের গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার অতি পরিচিত রূপ। অন্যদিকে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখনো যদি তমিজের বাপের দেহে ঘুমের ঘোরে বা কোনো কাজে ব্যস্ত থাকায় অমনোযোগিতাবশত কুলসুমের পা লাগে, তখন লোকসংস্কারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্র নারীকে পরাস্ত করতে সচেষ্ট থাকে। এ দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয় কুলসুমের প্রতি তমিজের বাপের রুঢ় আচরণে। নারী-পুরুষের আন্তঃসম্পর্কে বিদ্যমান অপরতাবোধ^{১১} এ ধরনের লোকসংস্কারকে বহুকাল ধরেই সমাজে টিকিয়ে রেখেছে। তমিজের বাপ ঘরের ভেতরের সংকীর্ণ মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমায়। ফলে মাচা থেকে নামতে গিয়ে কুলসুম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ, ‘ওই হাড়গিলা শরীরে তিল পরিমাণ জায়গাতেও তার পা ঠেকে তো সর্বনাশ, বুড়া একটা হলুস্থূল কাণ্ড করে বসবে।’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৪৩) এরপর তার স্মৃতিচারণায় ভাষ্যরূপ পায় বিয়ের দুই বছর পর এক সন্ধ্যারাতে তমিজের বাপকে ভাত দিতে গিয়ে কুলসুমের নাজেহাল হওয়ার বৃত্তান্ত। ট্যাংরা মাছ দিয়ে গোত্রাসে ভাত খেতে ব্যস্ত তমিজের বাপ কুলসুমের কাছে একটি পেঁয়াজ চায়। কুলসুম সেটি এনে তাকে দিতে উপুড় হলে তমিজের বাপের ডান হাতের কনুইয়ে তার বাম পা লাগে। সানকি থেকে সামান্য ভাত ছলকে মেঝেতে পড়লে সে তখনই কুলসুমকে প্রহার করতে থাকে। তমিজ তার বাপকে মদদ দিতে শুরু করে ভৎসনার পালা, ‘বাজারের ভাতের খালিত তুমি পাও দেও? ইটা কেমন কথা গো? মুখের রক্ত তুমি পাও দিয়া ঠেলো? নক্ষীর কপালেত তুমি নাথি মারো? কেমন মেয়ামানুষ গো তুমি?’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৪৩-৩৪৪)। স্বামী ও সৎছেলের দ্বারা লাঞ্ছিত কুলসুম জেদের বশে রাতে ভাত না খেয়েই বিছানায় শুলে তমিজের বাপ তাকে জানায়, ‘মেয়ামানুষ, তার এতো কোদ ভালো লয়, ভালো লয়। আজ পাছাবেলা থ্যাকা খলবল, খালি খলবল। নাফপাড়া মেয়ামানুষের কপালেত দুস্কু থাকে, সংসার ছারেখারে যায়’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৪৪)।

গ্রামীণ সমাজে জ্বিন সংক্রান্ত লোকসংস্কার বহুল প্রচারিত। এ উপন্যাসে মুনসি বয়তুল্লা শাহের অপঘাতে মৃত্যুর পর জ্বিন হয়ে কাৎলাহার বিল সংলগ্ন পাকুড়গাছে অধিষ্ঠানের কিংবদন্তির মূলেও এ লোকবিশ্বাস ভূমিকা পালন করেছে। প্রসঙ্গত, ব্যক্তিগত বা

সমষ্টিগত লোকবিশ্বাস যখন সমষ্টিমানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পরিণাম নির্দেশ করে, তখন এটি লোকসংস্কার হিসেবে বিবেচিত হয়। মুনসির জ্বিন হয়ে কারো ওপর নজর দেয়া বা কারো কোনো ক্ষতি হলে এজন্য মুনসিকেই দায়ী করার মানসিকতা গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার লোকসমাজে বিদ্যমান, যা উক্ত সংস্কারের প্রভাবজাত। গোরস্তানের শিরীষ গাছ, পিতরাজ গাছ, শ্যাওড়া গাছে জ্বিন-ভূত বাস করে, এরূপ লোকসংস্কারও গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচলিত। তাই মাদারিপাড়ার বাসিন্দা চেরাগ আলির স্মৃতিচারণায় এ ভৌতিক অনুষঙ্গ আতঙ্ক ছড়াত— ‘পুরনো আমলের গোরস্থান। একটা মস্ত শিরীষ গাছ, কয়েকটা পিতরাজের গাছ আর দুটো শ্যাওড়া গাছ। জ্বিন আর ভূতের আস্তানা। ফকিরগুপ্তির কেউ মরলে গোর দেওয়া হতো ওখানেই; কিন্তু দাফন সেরেই জ্যোন্ত মানুষগুলো তড়িঘড়ি করে ঘরে ফিরতো। পরে গোর জিয়ারত করতে যাবার সাহসও কারো হয় নি’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৫৪)। এমনকি সেখানে থাকতে সে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে হাঁটেনি। কারণ, লোকসমাজের রটনা হলো, বাঁশঝাড় জ্বিন-ভূত-অশরীরীর আসন। সে যমুনার করালখাসে বসতবাড়ি হারিয়ে অবশেষে গিরিরডাঙা গ্রামের কালাম মাঝির বাঁশঝাড়ে আশ্রয় পায়। তার নাতনি কুলসুম বাঁশঝাড়কে ভয় পেলেও আশ্রয়গ্রহণের তাগিদে তাকে সাহস যোগাতে চেরাগ আলি জানায়, ‘এই জায়গার বরকত দেখিছিস?’ হামাগোরে পরদাদারা এটি অ্যাসা আস্তানা লিখিলো। জ্বাতিগুপ্তির কতোজন এটি চোখ মুঞ্জিছে, তানাগোরে রুহ এখনো এটিই ঘোরাঘুরি করে রে বুবু, এই জায়গা জি সি জায়গা লয়’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৫৭)। ‘১২’ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, কাদেরের মতো শিক্ষিত, সচেতন যুবকও এ সংক্রান্ত সংস্কারে আচ্ছন্ন। শরাফত মণ্ডলের রায়ত হুরমতুল্লার নাতি তথা ফুলজানের অসুস্থ ছেলে ডাক্তারের কাছে যায় কালাজ্বরের চিকিৎসার জন্য। সেখানে তাকে দেখে কাদের চমকে ওঠে। তার মনোলোকেও যে গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ভৌতিক লোকসংস্কারের প্রভাব কার্যকর, তা প্রকাশিত হয়েছে স্বগতোক্তি— ‘শিশুটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে কাদেরের গা শিরশির করে। অনেকদিনের কালাজ্বর ও আজকের প্রবল জ্বরে সে পেয়েছে একটা ভূতের চেহারা। কে জানে তার ওপর কারো আসর ঠাসর পড়লো কি-না। মোষের দিঘিতে কোদালের কোপ পড়েছে, মহাদেব কি আর কোনো দেও তার মুখে ছাই ছিটিয়ে দিলো নাকি? না-কি কাৎলাহারের খানদানি বাসিন্দা চোখ দিলো তার ওপর? এখন এই ভূতের চিকিৎসা করার অনুরোধ সে ডাক্তারবাবুকে করে কোন আক্কেলে?’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪১১)

অভিশাপ দেয়ার দৃষ্টান্তও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। যদিও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে লোকমানসে সংশয় থেকেই যায়, তবু কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি তার বিপন্নতার জন্য দায়ী ব্যক্তির অনিষ্টকামনায় অভিশাপ উচ্চারণ করে। এ উপন্যাসের ‘২৭’ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, শরাফত মণ্ডল কাৎলাহার বিল থেকে বাঘাড় মাছ চুরির অপবাদে তমিজের বাপকে খড়মপেটা করার পাশাপাশি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। কারণ, জমিদারকে খাজনা দিয়ে সে বিলের স্বত্ব গ্রহণ

করেছিল। অথচ তমিজের বাপ এ মাছ ধরেছিল মানাস নদী থেকে। স্বভাবে হাবাগোবা ধরনের এবং কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ তমিজের বাপ এর প্রতিবাদ করতে পারেনি। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে অসুস্থ অবস্থায় সে বাড়ি ফিরলে কুলসুম এ বৃত্তান্ত জেনে শরাফত মণ্ডলকে অভিশাপ দেয়— “ ‘এই সাদাসিদা আবোর মানুষটাকও বলে খড়ম দিয়া মারে? বুড়া শকুন, মণ্ডলের হাতপাও খস্যা খস্যা পড়বি, বুড়া শকুন কুঠ হয় মরবি, তামাম গাওত তর কুঠ হবি।’ শরাফত মণ্ডলের হাতপা জুড়ে কুঠ ছড়িয়ে ফেলার জন্য অনির্দিষ্ট ও অপরিচিত কর্তৃপক্ষের কাছে সে বেশ কয়েকবার আবেদন জানায়। শেষে কুঠের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ মণ্ডলের শাস্তির জন্য যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় কোনো অপঘাতে সে তার আশু মরণ দাবি করে, ‘তেরাতির যাবি না, তোমরা শোনো, এক রাতও লাগবি না, বুড়া আজই মরবি। তার কিসের জোতজমি, তার কিসের বিল, বুড়ার মাখাত ঠাঠা পড়বি। ঠাঠা পড়বি!’” (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫২৩)। নজর লাগা বা খারাপ দৃষ্টি সংক্রান্ত লোকসংস্কারের উল্লেখ রয়েছে কুলসুমের সংলাপে। ‘১৩’ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, তমিজ হুরমতুল্লার জমিতে বর্গাচাষে ব্যস্ত বলে নিজের জমির পাকা ধান কেটে তোলার সময় করে উঠতে পারে না। কুলসুম এ ব্যাপারে তাড়া দিলে হঠাৎ তার খেয়াল হয়, সে সেদিন একবারও নিজের জমির ধান দেখতে যায়নি। হয়ত তার বহুকষ্টে ফলানো ধানের ওপর কেউ নজর দিয়েছে বলেই তমিজের এ বিষয়ে খেয়াল ছিল না, সে এমনটি ভাবে। পাশাপাশি এমন ভাবনাও তার মনে জাগে, নিজের ধানক্ষেতের ওপর বুঝি তারই নজর পড়েছে! সেকারণেই সে কুলসুমের কথা শুনে বিচলিত হয়।

গ্রামীণ লোকসমাজে বশীকরণ, তুকতাক প্রভৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। কেননা, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এর প্রতি আস্থা, নির্ভরতা বহুকাল ধরেই স্বীকৃত। তমিজ খিয়ার এলাকায় (যেখানে চাষাবাদের জন্য কৃত্রিম সেচব্যবস্থা প্রচলিত/ নাটোর ও তৎসংলগ্ন এলাকা) গিয়েছিল ক্ষেতমজুরের কাজ করে বাড়তি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে। সে বাড়ি ফিরলে তার সৎমা কুলসুম জানায়, খিয়ার এলাকার মানুষ ঘোর স্বার্থসচেতন। তারা নাকি ক্ষেতের কাজ, ঘর-গৃহস্থালির জন্য জোয়ান মজুরকে পেলে তাকে বশে আনতে পরিবারের মেয়েদের লেলিয়ে দেয়। সেসব মেয়েরা নাকি ডাইনি স্বভাবের। তারা ছলাকলা করে, মন্ত্রপড়া ধূলা ঝেড়ে ক্ষেতমজুরদের বশে এনে বিয়ের পর সেখানেই সংসার গড়ে তোলে। ফলে সেসব মজুররা নিজের দেশ ও পরিবারের কথা ভুলে আজীবন সেখানেই কাটায়। বলাবাহুল্য, কুলসুমের অভিমত তমিজের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি। এ দৃষ্টান্ত থেকে তার মনোলোকে সন্নিহিত লোকসংস্কারের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেলেও বাস্তবে এর কার্যকারিতার অসাড়াহুঁই প্রতিপন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে কুলসুমের অনুমান এতটাই বদ্ধমূল হয় যে, সে অতীতদিনের স্মৃতিচারণে বিভোর হয়ে যায়। তমিজ খিয়ার এলাকায় গিয়েছিল কৃষিকাজ করে উপার্জনের জন্য। কুলসুম চেয়েছিল তমিজ হুরমতুল্লার জমির আউশ ধান কাটার কাজ করুক। কিন্তু সে এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। এমতাবস্থায় এক বৃষ্টিমুখর বিকেলে একাকী অবস্থায় কুলসুম

অনুমান করে, তমিজ হয়ত কোনো বর্গাচাষীর স্ত্রী বা তার মেয়ের দেয়া চালভাজা বা কাঁঠালের বিচি ভাজা খাচ্ছে। কিন্তু তারা বিনা স্বার্থে নিশ্চয়ই তমিজকে এত সমাদর করছে না। এর বিনিময়ে তারা নির্ধাত তমিজকে দিয়ে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে সুতা বাঁধিয়ে জাল তৈরি করিয়ে নিচ্ছে। ‘এই সময়ে একটি টিকটিকির ঠিকঠিক আওয়াজ কুলসুমের অনুমানের যথার্থ্য নিশ্চিত করে’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৪৮)। টিকটিকি সংক্রান্ত এ ধরনের সংস্কারের প্রভাবও যে লোকমানসে সক্রিয় থাকে, এটি তার দৃষ্টান্ত।

এ উপন্যাসে ধর্মীয় লোকসংস্কার হিসেবে ফকিরান্তি বা ফকির খাওয়ানোর দৃষ্টান্তও লক্ষণীয়। মাদারিপাড়ার মাদারি ফকির হিসেবে কুলসুমের দাদা চেরাগ আলির পূর্বপুরুষেরা এ কাজের মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করত। যমুনা তীরবর্তী মাদারিপাড়ার খাল পেরিয়ে চন্দনদহ, শিমুলতলা, গৌসাইবাড়ি, ভবানীহাট, দরগাতলা প্রভৃতি স্থানে সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়িতে খতনা, কুলখানি, জেয়াফত, আকিকা, চেহলাম, মানত প্রভৃতি আয়োজনে ফকিরদের খাওয়ানোর রীতি বিশেষ গুরুত্বসহকারে প্রচলিত। মৃত ব্যক্তির কল্যাণ কামনায়, এমনকি তাকে স্বপ্ন দেখলে এর ব্যাখ্যা জানতে ফকিরদের শরণাপন্ন হবার রীতি লোকসমাজে প্রচলিত। জীবনধারণের তাগিদে চেরাগ আলি যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলত, মানুষের আবেগ ও সংস্কারশ্রুততাকে পুঁজি করে ক্ষুণ্ণবৃত্তি করত, কুলসুম তা বেশ ভালোভাবেই অনুধাবনে সমর্থ ছিল।

৩. লোকসাহিত্য- এ উপন্যাসে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার বাসিন্দাদের মধ্যে কিংবদন্তি^{১২} ও লোকসঙ্গীতের^{১৩} ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৩.১ কিংবদন্তি- এ উপন্যাসের লোকসমাজের মৌখিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে কিংবদন্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বগুড়ার কাংলাহার বিলসংলগ্ন গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামদ্বয় ও এর পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামে এসব কিংবদন্তি কয়েক প্রজন্মের বাসিন্দাদের মুখে মুখে প্রচলিত। এসবের মধ্যে প্রধান হলো ইংরেজ সেনাদলের সেনাপতি টেলরের সঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ও ফকির মজনু শাহের প্রতিনিধি মুনসি বয়তুল্লা শাহের বন্ধুকের গুলিতে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে অপঘাতে মৃত্যুর বৃত্তান্ত। এ কিংবদন্তি আরো বিস্তৃত হয়েছে মোষের দিঘির পত্তনসংলগ্ন কিংবদন্তির সঙ্গে, যার যোগসূত্র রয়েছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ভবানী পাঠক ও মজনু শাহের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ঘটনার।^{১৪} এছাড়া যমুনা নদীকেন্দ্রিক একটি স্থানীয় কিংবদন্তিও এতদঞ্চলে প্রচলিত। কেননা, এ নদীর ভাঙনের করালগ্রাসে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই হারায় চাষের জমি, জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন, এমনকি পরিবার-পরিজন ও পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত মাথা গাঁজার ভিটেবাড়িটুকু। উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তসমূহের সঙ্গে এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকসাহিত্য প্রভৃতির সমাবেশ ঘটেছে সময়ের

ধারাবাহিকতায়, যা তাদের গোষ্ঠীচেতনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি তাদের নিত্যদিনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, জীবিকানির্বাহরীতি, পারস্পরিক লেনদেন ও ওঠাবসা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতি গড়ে তুলতে এসব কিংবদন্তির এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানসমূহের জোরালো ভূমিকা লক্ষণীয়। যেমন, উপন্যাসের ‘১’ পরিচ্ছেদে মুনসি বয়তুল্লা শাহের অপমৃত্যুজনিত কিংবদন্তি উপস্থাপিত হয়েছে প্রান্তিক জেলে ও ভাগচাষী তমিজের বাপের দৃষ্টিকোণ থেকে, যে পূর্বপুরুষের স্মৃতিসংলগ্ন এ ঘটনাকে রীতিমত মান্য করে। আবার উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থিত অন্যান্য চরিত্র যেমন তমিজের বাপের দাদাশ্বশুর ও লোককবি চেরাগ আলি, তমিজ, ফুলজান, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি চরিত্রের স্মৃতিচারণায়ও এ কিংবদন্তি টুকরো টুকরোভাবে উপস্থিত। এসব সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলোর সমন্বয় ঘটালে তবেই সমগ্র কিংবদন্তিটি এবং এর অন্তর্গত লোক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব। তমিজের বাপ কাংলাহার বিলের উত্তরসিথানের পাকুড়গাছের তলায় পৌঁছলে তার মনোলোকে ভেসে ওঠে বয়তুল্লা শাহের কিংবদন্তি –

অনেকদিন আগে, তখন তমিজের বাপ তো তমিজের বাপ, তার বাপেরও জন্ম হয়নি, তার দাদা বাঘাড় মাঝিরই তখনো দুনিয়ায় আসতে ঢের দেরি, বাঘাড় মাঝির দাদার বাপ না-কি দাদারই জন্ম হয়েছে কি হয় নি, হলেও বন-কেটে বসত করা বাড়ির নতুন মাটি ফেলা ভিটায় কেবল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, ঐসব দিনের এক বিকালবেলা মজনু শাহের বেগুমার ফকিরের সঙ্গে মহাস্থান কেল্লায় যাবার জন্য করতোয়ার দিকে ছোট্টার সময় মুনসি বয়তুল্লা শাহ গোরা সেপাইদের সর্দার টেলরের বন্ধুকের গুলিতে মরে পড়ে গিয়েছিলো ঘোড়া থেকে। বন্ধুকের গুলিতে ফুটো গলা তার আর পুরোট হলো না। মরার পর সেই গলায় জড়ানো শেকল আর ছাইভস্মমাখা গতির নিয়ে মাছের নকশা আঁকা লোহার পাণ্ডি হাতে সে উঠে বসলো কাংলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছের মাথায়। সেই তখন থেকে দিনের বেলা রোদের মধ্যে রোদ হয়ে সে ছড়িয়ে থাকে সারা বিলটা জুড়ে। আর রাতভর বিল শাসন করে ওই পাকুড়গাছের ওপর থেকেই। তাকে যদি এক নজর দেখা যায়—এই আশায় তমিজের বাপ হাত নাড়াতে নাড়াতে আসমানের মেঘ খেদায়। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৩৩)

প্রায় অনুরূপ বৃত্তান্ত উপন্যাসের ‘৫৯’ পরিচ্ছেদে তমিজের বাপের পুত্রবধূ ফুলজানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত, যে কিনা ‘লোকে’-র মুখে বহুকাল ধরে প্রচলিত বয়তুল্লা শাহ সম্পর্কিত কিংবদন্তি আনমনে স্মরণ করে তার শিশুকন্যা সখিনার জেদি মনোভঙ্গির কার্যকারণ অনুধাবনে। কেননা, তার শ্বশুরের বংশের পূর্বপুরুষেরাও একরোখা স্বভাবের ছিল, যারা করতোয়াসংলগ্ন শ্বাপদসংকুল বন কেটে বসবাসের জন্য সমতল ভূমির পত্তন করে ভিটেবাড়ি গড়ে তুলেছিল। মুনসি বয়তুল্লা শাহের কিংবদন্তির অবশিষ্ট অংশও ‘১’ পরিচ্ছেদে তমিজের বাপের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত। মজনু শাহের অনুসারী হাজার হাজার ফকিরদের সঙ্গে করতোয়া নদীর দিকে এগিয়ে আসার সময় ইংরেজ

সেনাপ্রধান টেলরের গুলি খেয়ে সে সাদা ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে মারা যায়। ঘোড়াটির সর্বাঙ্গ তীরে বিদ্ধ হলেও সেটি যে কোথায় চলে যায়, এর খোঁজ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইংরেজ সৈন্যদের ভয়ে কাদার ওপর তিনদিন ধরে পতিত বয়তুল্লা শাহের আগুনে পোড়া মৃতদেহ দাফন করার সাহস কেউ করেনি। এরপর থেকেই লোকমুখে এ গল্প প্রচারিত হয়, মুনসি ‘গুলিতে ফাঁক করা গলা নিয়ে সোজা চড়ে বসলো পাকুড়গাছের মাথায়। মুনসি সেই থেকে আগুনের জীব। তার গোটা শরীর, তার লম্বা দাঁড়ি, তার কালো পাগড়ি, তার বুকের শেকল, তার হাতের পান্টি সবই এখন আগুনে জ্বলে’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৩৭)। এভাবেই তাকে জ্বিনরূপে কল্পনা করে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার বাসিন্দারা। এ কিংবদন্তির অন্তর্গত লোকবিশ্বাস তাদের চেতনালোকে ক্রমশ লোকসংস্কারে রূপান্তরিত হয়। যেমন- উপন্যাসের ‘১’ পরিচ্ছেদে তমিজের বাপ মৃত বয়তুল্লা শাহকে ‘মানুষ’ ভেবে পরমুহূর্তেই ভীত হয়। তার ধারণা, এর ফলে সে মুনসির কোপানলে পড়ে বিভিন্ন দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে। এর কারণ হিসেবে সে ইতঃপূর্বে সংঘটিত একটি পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে। লোকমুখে প্রচারিত, কারো ওপর মুনসির আছর হলে তার বিপদ ঘটবেই, এমনকি সারা জীবনে আর এর প্রতিকার সম্ভব নয়। তমিজের জন্মের পূর্বে তার মা আট মাসের গর্ভাবস্থায় একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীর ধারণা, যেহেতু তমিজের বাপ দিন-রাত খেয়ালখুশিমতো পাকুড়তলায় যায় এবং পাক-নাপাক ভেদাভেদ উপেক্ষা করে চলে, সে কারণেই তার প্রতি মুনসির নজর পড়ায় তার স্ত্রী এ মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এ ধরনের লোকসংস্কার মুনসির কিংবদন্তিকে ঘিরে কয়েক প্রজন্ম ধরে পল্লবিত হয়েছে। মুনসি সম্পর্কিত দুই গ্রামের বাসিন্দাদের সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা উপন্যাসের একাধিক পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে কখনো তমিজের, কখনো বা তার বাপের দৃষ্টিকোণে, সর্বত্রই পরাবাস্তব বিবরণযোগে। সেখানে সমগ্র কাৎলাহার বিল, এর অন্তর্গত সকল জলজ প্রাণী, বন ও বাঁশঝাড়ের পাখিকুল, সর্বোপরি গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার বাসিন্দাদের ওপরও তার একচ্ছত্র আধিপত্য সময়ের বিবর্তনে প্রতিষ্ঠিত।

এ উপন্যাসের কিংবদন্তির সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে লোকসঙ্গীত। বিশেষত, তমিজের বাপের দাদাশ্বশুর লোককবি চেরাগ আলির মুখে মুখে রচিত বিভিন্ন সঙ্গীতের প্রতিপাদ্য হলো বয়তুল্লা শাহের মৃত্যু ও মৃত্যুত্তর বিভিন্ন অলৌকিক-অতিলৌকিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ, যা যুগ যুগ ধরে গ্রামদ্বয়ের বাসিন্দাদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। যমুনার করালগ্রাসে ভিটেবাড়ি হারানোর পর নিজের গ্রাম ছেড়ে এতিম নাতনি কুলসুমকে নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে চেরাগ আলি হাজির হয় গোলাবাড়ির হাটে। সেখানে দোতার বাজিয়ে গান পরিবেশন করে উপার্জনের চেষ্টা চালানোর একপর্যায়ে জনৈক শ্রোতার সঙ্গে তার আলাপ ঘটে। সেই লোকটি তাকে জানায়, সে ইতঃপূর্বে পোড়াদহের মেলায় মুনসি বয়তুল্লা শাহের মৃত্যু বিষয়ক এ ধরনের সঙ্গীত শুনেছিল। এর জবাবে চেরাগ আলি বলে, ‘পোড়াদহের মেলাত

হামাগোরে যমুনা পারের মানুষ আগে কতো আসিছে। পোড়াদহ, বাগবাড়ি নুনগোলা, জোড়গাছা, আবার ওদিকে ধরো চন্দনদহ, কড়িতলা, রয়াদহ, কুতুবপুর-ব্যামাক মেলার মধ্যে হামাগোরে ফকিরগুপ্তির মানুষ কতো আসিছে। গান তো করিছে তারাই' (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫০৮)। উত্তরবঙ্গের যমুনা নদীসংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে কিংবদন্তি হিসেবে পল্লবিত মুনসির আখ্যানকে ঘিরে যেসব সঙ্গীত লোকমুখে প্রচলিত ছিল, মুখস্ত থাকায় চেরাগ আলি সেগুলো শ্রোতাদের গেয়ে শোনায়। অন্যদিকে, তমিজের বাপের এ কিংবদন্তির প্রতি গভীর আস্থা পোষণের পাশাপাশি মানসিক বিকারগ্রস্ততা তথা রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামের পথে হাঁটার প্রবণতা গ্রামবাসীর মধ্যে সৃষ্টি করে নতুন জল্পনা। তাদের ধারণা, চেরাগ আলি গানের মাধ্যমে মুনসির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সমর্থ। তার মৃত্যুর পর তমিজের বাপ একই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। সে অনেকটা অপ্রকৃতিস্থের মতো দিনরাত বিচার না করে যখন খুশি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং মুনসিকে দেখার জন্যই কাংলাহার বিলের উত্তরদিকের পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। সেকারণেই তমিজের বাপ মুনসির দয়ায় বিশেষ শক্তির অধিকারী, সে মানুষের বিপদের সমাধান দিতে পারে এবং ভবিষ্যত গণনায় পারদর্শী, এসব লোকবিশ্বাস তাদের মধ্যে দিনদিন গড়ে ওঠে। লেখক জানিয়েছেন, 'তমিজের বাপের সঙ্গে চেরাগ আলির মাধ্যমে পাকুড়গাছের (মুনসির) সরাসরি যোগাযোগের কথা গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা, গোলাবাড়ি, পালপাড়া, রানীরপাড়া, পারানিরপাড়া, এমন কি সাবগ্রাম ছাইহাটার সব মানুষ জানে' (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫৫৩)। মুনসির প্রতিনিধি হিসেবে চেরাগ আলি ফকির ও তার শিষ্য তমিজের বাপ এভাবেই বিবিধ কিংবদন্তির আলোকে গ্রামের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক ভাবনা ও আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

এ উপন্যাসে মোষের দিঘির পত্তনকে ভিত্তি করে দুটি ভিন্ন কিংবদন্তি প্রচারিত। এক্ষেত্রে প্রথমটি বিবৃত হয়েছে কলকাতাবাসী জমিদারের অধীনস্থ নায়েবের মাধ্যমে; যেটির বিপরীত ভাষ্য গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামদ্বয়ের বাসিন্দাদের মধ্যে বহুদিন ধরে প্রচলিত। এর সঙ্গে ফকির মজনু শাহ ও তার অনুসারীদের সঙ্গে ভবানী পাঠক ও তার শিষ্যদের সমন্বিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বৃত্তান্ত একইসূত্রে গ্রন্থিত। বৈকুণ্ঠ কেরামত আলির সঙ্গে আলাপকালে জানায় 'ভবানী পাঠকের কাছে মজনু বার্তা পাঠালো। কী? না - তোমার আছে আলি, হামার আছে কালি; তোমার তাকত আলির হাতত আর হামার শক্তি আছে মা কালির কাছে; - ঠিক কি-না? - হামরা একত্তর হই। আলি আর কালি একত্তর হলে কোম্পানি এক ঘড়ি খাড়া হয় থাকবার পারে? - তা হলে বোঝো। তখন দুইজনের মানুষ আর আলাদা থাকলো না। মুনসি তখন ভবানী সন্ন্যাসীর হুকুম শুনবি না কিসক?' (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪৮৮)। প্রথম কিংবদন্তিটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত নয়। শুধু জমিদারের নায়েবই এ সম্পর্কে অবহিত। ধারণা করা চলে, নায়েব কোনোভাবেই চায় না, মোষের দিঘিতে নমঃশূদ্রসহ 'জাত-বেজাতের' মানুষের স্পর্শ পড়ুক। সেকারণেই সে দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্তের সঙ্গে এ কাল্পনিক কাহিনী যুক্ত করে গ্রামবাসীকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট। সে

বৈকুণ্ঠ গিরি ও শরাফত মণ্ডলের সঙ্গে আলাপকালে জানায়, ‘ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মহাদেব নিজের হাতে মোষের দিঘি খুঁড়েছেন এক রাতের মধ্যে। তাও আবার মা দুর্গার আবদারে’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৯৮)। দেবী দুর্গার মন্দির নাটোরের জমিদারির অন্তর্গত ভবানীপুরে। সে এ কিংবদন্তির সঙ্গে যুক্ত করে দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্তকে। সেই আয়োজনের একপর্যায়ে দুর্গা মৃত্যুবরণ করলে মহাদেব ক্রোধান্বিত হয়ে সেটি নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে থাকে। ‘তো নারায়ণ দেখলেন, মায়ের দেহে পচন ধরলে ধরিত্রীর বায়ু বিষাক্ত হয়ে যাবে। তিনি তার চক্র দিয়ে মায়ের পবিত্র দেহ টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বময়। নানা স্থানে পড়লো দেহের নানা অংশ’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫৫১)। দুর্গার বাম কান করতোয়া সংলগ্ন ভবানীপুরে পতিত হলে সেখানেই তার নামে মন্দির গড়ে ওঠে। তবে দ্বিতীয় কিংবদন্তিটি দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ফকির মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক একত্রিত হলেও শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়। ভবানী পাঠক এ দিঘির পাড়ে ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে নিহত হয়। বৈকুণ্ঠ জানায়, ‘মুনসি আছিলো ভবানী পাঠকের সেনাপতি। গান শোনো নাই, ভবানী নামিল রণে, পাঠান সেনাপতি সনে’, এই সেনাপতিটা কও তো কেটা?’ ... পাকুড়গাছের মুনসি হলো ওই সেনাপতি। মজনু শাহের লিজের মানুষ আছিলো তাঁই। এখনো কালীপূজার আত্রে ভবানী পাঠকের আদেশে মুনসি কাত্রা ভাসায়া দেয় বিলের মধ্যে, ওই কাত্রার মধ্যে কালা পাঠা বলি দিবার পারো তো তোমার সর্ব পাপ মোচন হবি। আরে এই খপর তো এটিকার ক্যাচলা ছোলও জানে’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪৮৭-৪৮৮)। শরাফত মণ্ডল ছেলেবেলায় শুনেছিল, ইংরেজ সৈন্যদের হত্যার পর হাতের খাঁড়াটি ধোয়ার জন্য ভবানী পাঠক এ দিঘি কেটেছিল। এ দিঘির পাশেই নাকি সে নিহত হয়। বৈকুণ্ঠ কেরামত আলির সঙ্গে আলাপকালে জানায়, ভবানী পাঠক ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইকালে কামানের গোলার আঘাতে মানাস নদীর তীরে মৃত্যুবরণ করে। এ প্রসঙ্গে শরাফত মণ্ডল জানায়, এসব কিংবদন্তি সম্পর্কে এ এলাকার সকলেই পরিচিত –

আষাঢ়ের অমবস্যায় রাত্রি আড়াই প্রহরে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে, পাকুড়গাছ থেকে অল্প তফাতে পানিতে একটা কাত্রা ভেসে ওঠে। কাত্রা মানে বলি দেওয়ার জন্যে জোড়া কাঠ। ... ওই কাত্রা ভেসে উঠলে সেখানে জোড়া পাঁঠা বলি দিলে শত্রু বিনাশ হয়, বিলের দুই ধারে রোগবালাই থাকে না। তা এখন আর কেউ বলি টলি দেয় না, তাই কাত্রাও বুঝি রাগ করে আর ভেসে ওঠে না। – বলি দেবে কোথেকে? বলির পাঁঠা তো কিনে আনলে চলবে না। সেই রাতে মুনসির পোষা গজারের সবগুলি ভেড়ার আকার পায় না, এক জোড়া গজার মাছকে মুনসি সেই রাতে ভাসিয়ে দেয় সাদা পাঁঠার শরীরে। কবে কয়শো বছর আগে কোন সন্ন্যাসী এদিকে এসেছিলো, মানাস নদীর তীরে লড়াই করতে করতে কোম্পানির গোরা সেপাইদের সে নাকি নিজের হাতে বলি দিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী মারা পড়ে সেপাইদের হাতেই। তা মরে গিয়ে লোকটা বছরের একটা দিন এখানে আসে, বিল থেকে কাত্রা তুলে

নিয়ে মুনসির দেওয়া পাঁঠা বলি দিয়ে সে ঠাই নেয় পোড়াদহ মাঠের বটতলায় সন্ন্যাসীর থানে। যাবার আগে বলি দেওয়ার খাঁড়াটা সে ধুয়ে নেয় মোষের দিঘিতে। ওই রাতে মানুষজন এদিকে আসে না, আসা নিষেধ। কিন্তু পরদিন মোষের দিঘির মাঝখানে গোলাপি রঙের পানি ভাসতে থাকে। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪০১)

এ উপন্যাসে যমুনা নদী, মানাস, বাঙাল প্রভৃতি নদীর পাশাপাশি কাংলাহার বিল গড়ে ওঠা সম্পর্কিত কিংবদন্তির উল্লেখ রয়েছে। চেরাগ আলি ও তার নাতনি কুলসুমের পারম্পরিক আলাপে এ কিংবদন্তি উপন্যাসে সংযুক্ত হয়েছে। মাদারিপাড়ার বাসিন্দা চেরাগ আলি যমুনা নদীর প্রবল ভাঙনে সর্বস্ব হারায়। সে গল্পের ভঙ্গিতে কুলসুমকে জানায়, তার পরদাদার আমলে যমুনা ছিল একটি খাল।^{১৫} ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইকালে ফকিররা নাকি ঘোড়ায় চড়েই এটি পারাপার করত। অবশেষে এ লড়াইয়ে ইংরেজরা জয়ী হবার পঞ্চাশ-ষাট বছর পর ফকিরদের জনৈক সর্দার পীরের অভিশাপে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হলে সেই খালটিই নদীতে পরিণত হয়। এ কিংবদন্তি বিষয়ক অন্য আরেকটি আখ্যান বিবৃত হয়েছে তমিজের বয়ানে। সে তার মায়ের নিকট থেকে এ কিংবদন্তি শুনেছিল। তমিজের বংশের প্রথম পূর্বপুরুষ সোভান ধুমা ও তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কাংলাহার বিলসংলগ্ন বন সাফ করে বসতি গড়ার প্রসঙ্গে সে এ স্মৃতিচারণ করে। ‘সোভান ধুমার নাতি না তার নাতির বেটার আমলে একবার আসামে না রংপুরে না-কি দিল্লিতেই হবে, না বার্মায়— কোথায় ভূমিকম্প হলে কোথাকার বড় গাঙের পানি সব এসে পড়লো পুর্বের যমুনায়’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৭১)। যমুনা তখন ছিল একটি সরু খাল। আকস্মিক ভূমিকম্পে সেটি প্রবল স্রোতে প্লাবিত হলে চারপাশের জায়গাজমি-বসতভিটা পানিতে ডুবে যায়। এরই স্রোত বাঙাল নদীতে এসে পড়ে এবং পরবর্তীকালে বাঙালি নদী থেকেই কাংলাহার বিলের মতো একটি জলা বিরাট আকৃতি ধারণ করে। একপর্যায়ে সেই বিল বাঙালের স্রোত সামলাতে না পেরে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙাকেও ভাসিয়ে নিলে ‘মুনসির আর সহ্য হলো না, পাকুড়গাছ থেকে সে তার জোড়া পা পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ গজ বাড়িয়ে বিলের দক্ষিণ পশ্চিম পাড়ে মারলো এক লাথি। সেখানে ... বানের পানি গলগল করে ঢুকে পড়লো পাড়-ভাঙা বিলের ভেতর। বাঙালি নদীর স্রোত দুটো ধারায় এসে পাকুড়গাছে কদমবুসি করে গাছের দুই ধার দিয়ে এসে মিশলো বিলের পানিতে।’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৭২)

৩.২ লোকসঙ্গীত – এ উপন্যাসে চল্লিশটি লোকসঙ্গীত বিবৃত, যেগুলো এক চরণ থেকে সর্বোচ্চ আঠারো চরণ বিন্যস্ত। কিছু কিছু চরণ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এসব সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে মূলত চেরাগ আলি ও কেরামত আলির কণ্ঠে। লক্ষণীয়, এ উপন্যাসে লোকসঙ্গীতের ভাষা আদ্যন্ত সাধুরীতির এবং অন্ত্যমিলবিশিষ্ট, কখনো বা ত্রিপদীর কাঠামোতে বিন্যস্ত। গ্রামীণ জনসমাবেশে ‘শোলোক’ হিসেবে ধীরকণ্ঠে পরিবেশিত গানগুলোতে প্রতিপাদ্য হিসেবে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিভিন্ন কিংবদন্তি, গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন গালগল্প সমন্বিত অলৌকিক-অতিলৌকিক

প্রসঙ্গ বিবৃত। পাশাপাশি এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার বিভিন্ন অনুষ্ণ, সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ যেমন তেভাগা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের বিরোধ প্রভৃতিও এসব গানের আধার হিসেবে উপস্থাপিত। বগুড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের প্রান্তিক লোকসমাজে এসব গানের প্রভাব ব্যাপক। সেকারণেই লোককবিদের প্রতি তাদের আস্থা এবং নির্ভরতা সংশয়াতীত। কুলসুমের দাদা চেরাগ আলির মুখে মুখে তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা ও পরিবেশনের সামর্থ্য তাকে গ্রামবাসীর নিকট উন্নীত করে দৈবী শক্তিসম্পন্ন মানুষে। তাছাড়া এতদঞ্চলে বহুকাল ধরে প্রচলিত পূর্বসূরীদের পরিবেশিত গানগুলো মুখস্ত রাখার ফলেও তার জীবিকা নির্বাহে এটি বিশেষ সহযোগী মাধ্যম হয়ে ওঠে। দোতারার সুরে কিছুটা কর্কশ কণ্ঠে গুনগুন করে সে যখন গান পরিবেশন করে, সমাবেশে উপস্থিত শ্রোতাদের চারপাশে আকস্মিকভাবেই ঘোরময় আচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়। প্রাত্যহিক জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে চেরাগ আলির পরিবেশিত গানের মাধ্যমে লব্ধ চিত্তবিনোদন তাদের উজ্জীবিত করে। অন্যদিকে, তার শিষ্য কেরামত আলি নিজেই গান রচনা ও পরিবেশনে অভ্যস্ত। সেকারণে তার প্রতি মানুষের তেমন আগ্রহ নেই। তবে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার বাসিন্দাদের ইসলামী মূল্যবোধে ঐক্যবদ্ধ করতে ক্ষমতাশালী জোতদার শরাফত মণ্ডলের ছোট ছেলে আবদুল কাদের ও তার দলের নেতা ঈসমাইলের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীন পাকিস্তানের আকাঙ্ক্ষা, মুসলিম লীগ-কংগ্রেসের দ্বৈরথ প্রভৃতি প্রসঙ্গ তার গানে উপজীব্য হয়, যা এতদঞ্চলের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে বৈকুণ্ঠ গিরি, যে সন্ন্যাসী বংশের সন্তান হিসেবে পূর্বসূরীদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দুঃসাহসে বলীয়ান, তার কণ্ঠে পরিবেশিত হয় ভবানী পাঠকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিজ্ঞাপক কীর্তন সঙ্গীত। লক্ষণীয়, এতদঞ্চলের লোকমানুষের জীবনবাস্তবতাকে রূপায়ণের প্রয়োজনে লেখক সচেতনভাবেই অবলম্বন করেছেন মধ্যযুগে রচিত পুথিসাহিত্যের ভাষাকে, যা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহকালীন ভাবাবহকে পাঠকের চেতনালোকে জাগিয়ে তোলে।^{১৬} তাদের কণ্ঠে পরিবেশিত দুটি সঙ্গীত দৃষ্টান্ত হিসেবে নিচে যথাক্রমে বিবৃত হলো -

ক.

গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়।

গলা ঝাঁঝরা কোম্পানির কামানের গোলায় ॥

নিন্দের সোয়ারি ফকির ধীরে দাঁড় বায়।

বাবরি চুলের ছইখানি

ওপরে চেরাগদানি

চেরাগে আতশ নাই নাও ডুবে যায়।

দেহ জখম কোম্পানির কামানের গোলায়।

গোল করিও না সাগরেদ ফকিরে ঘুমায় ॥

রৌদ্রে ফাটে ঝাঁঝরা গলা

তামাম নদীর পানি ঘোলা

আজলা ভরা পানি তাহার পিয়াস না মিটায়।

নিন্দের সোয়ারি ফকির ধীরে দাঁড় বায় ।
গোল করিও না বান্দা ফকিরে ঘুমায় ॥ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪৮৫)

খ.

ভবানী নামিল রণে পাঠান সেনাপতি সনে
গোরা কাটো আদেশে হুঙ্কারে ।
ভবানীর কণ্ঠধ্বনি মৃগরাজধ্বনি জিনি
গর্জনে শাদুলে লজ্জিত । ...
গিরিগণে নামে জলে যতনে লইল কোলে
কৃষ্ণ কোলে যেন শত রাই ।
পাষাণে হৃদয় বান্ধো কান্দো গিরিগণে কান্দো
ভবানী পাঠক ভবে নাই । (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৬৮-৩৬৯)

৪. লোকোৎসব- এ উপন্যাসে লোকোৎসব হিসেবে মেলার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পোড়াদহের মেলা।^{১৭} তবে পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বাগবাড়িতে নিশানের মেলা, দক্ষিণে এলাঙ্গির মেলা, রয়াদহের ফকিরের মেলা প্রভৃতি বগুড়ার গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় । তাছাড়া ‘করতোয়ার পশ্চিমে চৈত্র পর্যন্ত তো সপ্তাহে সপ্তাহে কোথাও না কোথাও মেলা একটা লেগেই থাকে’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫২০) । নিশানের মেলায় কর্মকারেরা বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষিকাজের সরঞ্জামাদি আনে । যেমন লাঙলের ফলা, কোদাল, কুড়াল বাঁটি প্রভৃতি । ফসল ফলানোর প্রয়োজনে মূলত চাষীরা এসব কেনে । করতোয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এ মেলা বসে । তবে পোড়াদহের মেলা উত্তরাঞ্চলের প্রধান মেলা, যেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করে । কথিত রয়েছে, ভবানী পাঠক এ মেলার প্রবর্তক । একারণে এ মেলায় সন্ন্যাসীরাও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করায় এর অন্য নাম সন্ন্যাসী মেলা । উপন্যাসের ‘২২’ পরিচ্ছেদে বৈকুণ্ঠ কেরামতকে জানায়, ‘এই যে পোড়াদহের মেলা, এই মেলা প্রথম চালু করে ভবানী পাঠক, আহা বড় সখের মেলা তার । দেহ রাখার পর তিনি প্রস্থান করেছেন কৈলাসে, কিন্তু বছরকার একটি দিন তাঁকে এখানে দেখা যায় । কে দেখে? ... সন্ন্যাসী জাতের মানুষ যদি শুদ্ধ বস্ত্রে, শুদ্ধ চিত্তে মেলার আগের দিনে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মোষের দিঘির উঁচু পাড়ে তালগাছের তলায় দাঁড়ায় তো খাওয়া পরার অভাব হবে না, লোকালয়ে সবার সম্মান সে পাবে এবং পরজন্মে কি পাবে না পাবে তা আর নাই বললো! সেটা জানে শুধু ঠাকুর’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪৮৭) । উক্ত লোকবিশ্বাসের সঙ্গে লোকপ্রথার বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও এ মেলাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে । সেটি হলো নাইয়ের প্রথা । গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামের বাসিন্দাদের শ্বশুরবাড়িতে মেয়ে-মেয়েজামাইকে এবং তাদের আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি মেলায় অংশগ্রহণের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, এ মেলাকে ভিত্তি করে স্থানীয় লোকগোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয় । তমিজকে

ফুলজান জানায়, তার বড় মামা এসে ফুলজানের বাবা-মা, ছোট দুই বোনকে নাইয়েরে নিয়ে গেছে। এ মেলা উপলক্ষে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী কেনাবেচা হয়। হুরমতুল্লা ‘মেলায় বেচবে বলে কাল তেলিহারা হাট থেকে কেশুরের বিচি আর মুলার বিচি কিনে এনেছে। নবিতন গোটা বিশেক পাটের শিকা বুনে রেখেছে, খুব নকশা করা শিকা। দাম মনে হয় ভালোই উঠবে। অন্তত ভদ্রলোকেরা তো পছন্দ করবেই। ... কামালপুর, আওলাকান্দি আর আমতলি থেকে ছুতাররা গোরুর গাড়ি করে কাঠের খাট, পালং, তক্তপোষ, আলনা, বেঞ্চি আর পিঁড়ি, জলচৌকি এসব আনতে শুরু করেছে’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫০৩)। অন্যদিকে তমিজের বাপ একটি বড় আকৃতির বাঘাড়া মাছ ধরে মেলায় বিক্রির ব্যাপারে ভাবছিল। এ মেলা উপলক্ষে শ্বশুরবাড়িতে আগত জামাইদের যথাসম্ভব সমাদর করা হয় নতুন পোশাক উপহার দিয়ে, ভালো খাবারের আয়োজন করে এবং মেলা উপলক্ষে হাতখরচ দিয়ে। দশরথ কর্মকারের মেয়ে-জামাইয়ের প্রতি বিরূপতার বিশেষ কারণ, সে অসৎ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। তাছাড়া নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে তার আগ্রহ প্রবল। হুরমতুল্লার সঙ্গে মেলায় দেখা হলে তাদের পারস্পরিক আলাপে বিষয়টি ফুটে ওঠে – ‘সারা বছর কোনো যোগাযোগ রাখে না, ... আবার দেখো সন্ন্যাসীর মেলা লাগার তিন দিন আগে এসে হাজির একেবারে গুপ্তিগুপ্ত। বোন বোনাইকে পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। জামাইকে ধুতি দাও, তার বোনাইকে ধুতি দাও, মেয়েদের শাড়ি দাও। হ্যান দাও ত্যান দাও। দুই সন্ধ্যা মাছ দিয়ে ভাত খাওয়াও, পিঠা বানাও, পায়ের স্নান করো। আবার মেলার দিন জামাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে নগদ সাতটা টাকা। যুধিষ্ঠির দেখে এসেছে, জামাইবাবু তার বসে গেছে জুয়ার আসরে’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫২০-৫২১)। এ মেলা উপলক্ষে সার্কাসের দল আসে, যা দেখতে দর্শকরা ভিড় জমায়। এমনকি, দেহব্যবসা ও জুয়ার আসরের বন্দোবস্তও সেখানে থাকে। মেলায় বিভিন্ন খাদ্য বিক্রি হয়। তমিজ ‘শালপাতার ঠোঙায় জিলাপি, কদমা, বেগুনি, পেঁয়াজি, বিভিন্ন ধরনের তেলে-ভাজা খলুইতে বড়ো মাছের ভাগা প্রভৃতি কিনে নিয়ে আসে।

সন্ন্যাসীর মেলাকে ঘিরে বৈকুণ্ঠের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ‘২৪’ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, বৈকুণ্ঠ ভবানী সন্ন্যাসীকে একবার দেখার জন্য মাঝরাতে হাজির হয় মোষের দিঘির উঁচু পাড়ের তালতলায়। সেখানে একঠায় দাঁড়িয়ে সে নজর রাখছিল পাকুড়তলার পশ্চিম সন্ন্যাসীদের ভিটার ওপর। তার ধারণা, ‘মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরের পর বারবেলায় ভবানী ঠাকুর এসে আসন গ্রহণ করবে পোড়াদহ মাঠের বটতলায় তার বিগ্রহের মধ্যে। তখন থেকে সন্ন্যাসীর পূজা। রাত্রি দুই প্রহর কাল পর্যন্ত সন্ন্যাসী পূজার ভোগ নেবে, তারপর কৈলাসধামে প্রত্যাবর্তন কালে মোষের দিঘির পাশ দিয়ে গিয়ে পাকুড়গাছের দিকে কয়েক পলক নজর দিয়ে ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে পৌঁছে যাবে নিজের ভিটার ওপর। সূর্যঠাকুর পূব আকাশ জুড়ে সিঁদুরের ছোপ লাগানো শুরু করবে আর সন্ন্যাসীও মিলিয়ে

যাবে আলোর মধ্যে আলো হয়ে। নিজের শিষ্যসঙ্গীদের বংশধর, অন্তত দশনামীদের কাউকে না দেখলে ঠাকুর কষ্ট পাবে জেনেই তো বৈকুণ্ঠ তার ঠাকুরদার সৎ ভাইদের ছেলেদের প্রতারণা মেনে নিয়ে বিঘা বিঘা জোতজমি জ্যাঠাতুতো খুড়তুতো ভাইদের ভোগ করতে দিয়ে নিজে পড়ে রয়েছে এখানে। এই রাতে কি তার ঘুমিয়ে থাকলে চলে?’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫০৩)। এভাবেই পোড়াদহের মেলাকে ভিত্তি করে এতদঞ্চলের লোকসমাজের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিচয় উন্মোচিত হয়।

৫. লোকখাদ্য- এ উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে-

বুড়া যদি শাপলার ডাঁটা কয়টা তুলে আনতো! তাহলে কী হতো! তাহলে বেশি করে মরিচ দিয়ে, রসুনের কয়টা কোয়া কুচিয়ে ফেলে কুলসুম কি সুন্দর চচ্চড়ি রঁধে ফেলে। একটু চচ্চড়ি হলে পোড়া মরিচ কয়টা ডলে নিয়ে তমিজের বাপ তিন সানকি ভাত সেঁটে ফেলতে পারে একাই। ... কাল সকালে কয়েকটা শাঁক আলু পেটে জামিন দিয়েছিলো কুলসুম। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৪০)

ট্যাংরা মাছ দিয়ে গোত্রাসে ভাত খেতে খেতে তমিজের বাপ একটা পেঁয়াজ চাইলো। ... ছলকে-পড়া ডালের সঙ্গে ভাতের কয়েকটা দানা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ট্যাংরা মাছের চচ্চড়ির মাছের কণা কি বেগুনের কুচি কি পোড়া মরিচের কামড়ানো টুকরা সব যেমন ছিলো তেমনি রয়ে গিয়েছিলো সানকির ভেতরেই। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৪৩)

দুপুরবেলা ভাত ও আলু দিয়ে পাক-করা বোয়াল মাছের ঘাঁটি সালুন এবং সকাল থেকে দুপুর ও দুপুরে ভাত খাবার পর থেকে রাতে খাবার আগে পর্যন্ত দুই দফায় মুড়ি, বাতাসা ও খাগড়াই খেয়ে বাড়ি ফিরে তমিজের বাপ টইটুম্বুর পেটে হাত বুলাতে বুলাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৬৬)

জিভে তামাকের গন্ধ-মাখা একটু-আগে-গেলা ভাত, খেসারির ডাল, বেশি মরিচ দিয়ে রাঁধা খলসে মাছ-বেগুনের চচ্চড়ির স্বাদ একটু খানি পেয়েই তমিজের গায়ে বল আসে। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৮৫)

বাপটা তো কিপটের একশেষ, জমির আলে কুলগাছতলায় সানকি ভরা পান্তা মরিচ দিয়ে ডলে খেতে খেতে মুখের কথাটাও বলে না, ক্যা গো, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে? আর এ কঙ্কুসের বেটি গুড়ের ফুটানি মারে। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৯৩)

হরমতুল্লার বড়ো বেটির সবই ভালো। সুযোগ পেলেই তমিজের হাতে পোড়া আলুটা, চালের আটার বুটিটা কিংবা ঠাণ্ডা একটা ভাপা পিঠা গুঁজে দেয়। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪১৪)

বুটের ডাল অনেক দিন খাওয়া হয় না। কুলসুম চিতই পিঠা করলে বুটের ডাল দিয়ে খাওয়া যাবে। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৪৭১)

তমিজ মেলায় ফুটি করে ফিরলো এত রাতে। ... শালপাতার ঠোঙা করে জিলেপি এনেছে, কদমা এনেছে, বেগুনি পেঁয়াজি, কতোরকমের তেলে-ভাজা। (ইলিয়াস, ২০১২ : ৫১৯)

‘বেনবেলা পান্তা খানু মরিচপোড়া দিয়া, না আইটা কলাও বুঝি আছিলো।’ ... মুড়ি খেতে খেতে আর কথা বলতে বলতে গলা কাঠ হয়ে এলে বৈকুণ্ঠ কুলসুমকে ডাকে, এ কুলসুম, তোর হাতের আমটা দে।’ (ইলিয়াস, ২০১২ : ৩৮৯)

৬. লোকভাষা – এ উপন্যাসে লেখক বগুড়ার লোকভাষাকে ব্যবহার করেছেন পাত্রপাত্রীদের সংলাপ নির্মাণে। স্থানীয় ও দেশজ শব্দের ব্যবহার এতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু আমাদের গবেষণাভুক্ত অন্যান্য উপন্যাসিকের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে—আলংকারিক বাক্য এবং বাগধারার প্রয়োগের মাধ্যমে চরিত্রসমূহের প্রবণতা ও মনস্তত্ত্বকে পরিস্ফুট করে তোলা, এ উপন্যাসে লেখক সচেতনভাবেই সে উদ্দেশ্য সাধনে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। তিনি পাত্রপাত্রীর বিভিন্ন ধরনের সংলাপের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তাদের অঙ্গভঙ্গি ও বাক্য উচ্চারণের বিশেষ ধরনকে। এর ফলে কোনো নির্দিষ্ট দৃশ্যের পটভূমিতে সংঘটিত ঘটনাটি পাঠকের মনোলোকে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া চরিত্রসমূহের ধারাবাহিক সংলাপ বিনিময়ের রীতিকেও তিনি এ উপন্যাসে জোরালোভাবে মান্য করতে চাননি। বরং কোনো ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীদের ভূমিকা, তাদের মনোভঙ্গি ও ভাবনাকে তিনি নিজেই বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এ উপন্যাসে লোকভাষায় প্রযুক্ত শব্দভাণ্ডারের দৃষ্টান্ত নিচে উপস্থাপিত হলো –

শব্দভাণ্ডার

বিশেষণ– চুপসে, টুকটুকে, ছেঁড়া, কুচকুচে, উপুড়, হামাগুড়ি, জিরিয়ে, ছিনাল, ঝালাই, ঠুনকো, পুরোট, ভাঙাচোরা, গোটানো, ঠেস, ফোলা, উড়াল, খটখটে, নুয়ে, হাবুডুবু, তোলপাড়, দোমড়ানো, ছটফট, ছেঁড়াখোরা, ভাঙানিয়া, নেতানো, দগদগ, আঁশটে, সোঁদা, কুচকে, পানসে, ঝাপটা, রোগাপটকা, কালোকিষ্টি, টইটুম্বর, হাড়গিলা ইত্যাদি।

ক্রিয়া– ছোবল, খেদায়, ঝেড়ে, হাঁকডাক, খসে, ঠেকলে, বেঁধা, ঠেলে, খুবলে, শৌকা, রেঁধে, ঘেঁটে, জিরিয়ে, জুটবে, ঠেকিয়ে, তোতলায়, খাটে, ঝিমাতে, গোটাতে, ভুলকি, বিয়ালে, নেয়ে, জুটেছিলো, চ্যাচালে, কাটিছে ইত্যাদি।

অনুকার অব্যয়– তিরতির, ছপছপ, ছমছম, পটপট, শিরশির, ভোঁ ভোঁ, চনচন, খরখরে, ফ্যালফ্যাল, গুজুরগাজুর, ফুসুরফাসুর, চপচপ, ঝাঁ ঝাঁ, চকচক, ঝমঝম, গনগন, হনহন, খরখর, ঠুকেঠুকে, গুনগুন, চিনচিন, গরগর, টুনটুন ইত্যাদি।

দেশজ শব্দ– গতর, পোয়াতি, পোলা, গোলা, পান্টি, বিল, সিথান, মেলা, ভাঁটা, চাষা, কলু, খাল, গাদা, ভেরেভা, ঝোপ, চ্যাংড়াপ্যাংড়া, মই, ছোলপোল, ডাঙা, পুব,

বেড়জাল, ওম, বৈঠা, ডোরা, খোসা, চুলকানি, ভিটা, খোঁচা, কপাট, হাট, বড়শি, ঘাট, শ্যাওড়া, মাচা, চচ্চড়ি, সানকি, উনান, শাক, সরা, উস্কে, কিল, প্যাঁচাল, খিয়ার, হাঁচড়েপাঁচড়ে, মালসা, ঠাহর, চিৎপটাং ইত্যাদি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি- ঢঙ>অঙ, কাজ>কামোত, ল্যাম্প>ল্যাম্পো, কেমন করে>ক্যাংকা কর্যা, লাফ>নাফ, গল্প>গল্পো, ঠেকছে>ঠেকিচ্ছে, ঘুমাস>নিন্দ পাড়িস, কেন>কিসক, কোথায়>কোটে, থেকে>থ্যাকা, কেমন>ক্যামা, ভোররাতে>পাহারাতে, গর্ভ>গভভো, দুঃখে>দুস্কে, সকাল>বেনবেলা, কেন>কিসক, দেখছে>দেখিছি, রান্না>পাকশাক, রাত্র>আত্র, ওখানে>ওটি ইত্যাদি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এ উপন্যাসে চল্লিশের দশকের পটভূমিতে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার গ্রামীণ লোকজীবনের চালচিত্র বিস্তৃত পরিসরে রূপায়িত হয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক অভিঘাত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রের কায়েম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের সমান্তরালে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ভাবপরিমণ্ডল-সঞ্জাত উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ লোকগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও বহমান সংস্কৃতির পরিচয় এতে নিবিড়ভাবে উপস্থাপিত। লেখকের নৈর্ব্যক্তিক ও ভাবাবেগশূন্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামীণ লোকমানুষের সমষ্টিচেতনাকে যথাসম্ভব বাস্তবানুগভাবে ভাষ্যরূপদানে সক্রিয়। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক বীক্ষার সঙ্গে শৈল্পিক বোধের যথাযথ সমন্বয় ঘটেছে বলেই বাংলাদেশের লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতিনির্ভর উপন্যাসের ধারায় খোয়াবনামা ধ্রুপদী মর্যাদায় আসীন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. খোয়াবনামা (১৯৯৬) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যিক পরিকল্পনা, দীর্ঘ সময়, অক্লান্ত পরিশ্রম, বিষয়গৌরব ও প্রকরণরীতির প্রাতিশ্রিক বুননের সমন্বিত ফসলরূপী সাম্প্রতিককালের শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস। বিষ্ণু বসুকে দেয়া সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছেন, এর প্রথম অংশ (২৯ পৃষ্ঠা, মূল উপন্যাস ৩৬০ পৃষ্ঠার) প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত লিরিক পত্রিকায় ('আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা'য় ১৩৯৯ সালের বৈশাখে) এর প্রায় চার বছর পরে (১৯৯৬) উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। [আলাউদ্দিন মণ্ডল সম্পাদিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : চূর্ণ ভাবনা ও চূর্ণ কথা সংগ্রহ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮২]। পশ্চিমবঙ্গের লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়কে ১০.০৭.১৯৮৯ তারিখে লেখা চিঠিতে ইলিয়াস জানান- 'নতুন একটা উপন্যাসে হাত দেবো করে অনেকদিন ধরে পায়তারা কষছি, শুরু আর করা যাচ্ছে না।' (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬)। মহীবুল আজিজকে ২১.০৭.১৯৮৯ তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি জানান- 'একটি উপন্যাস মাথার ভেতর দিনদিন তেলেজেলে বেড়ে উঠছে, এখন লিখতে ভয় হয় যে রক্তমাংসের যোগান ঠিকমতো দিতে না পারলে একটা ল্যাজেগোবরে কাজ করে ফেলব।' (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬)।

হাসান আজিজুল হককে ১০.০২.১৯৯১ তারিখে লিখিত চিঠিতে ইলিয়াস জানান- ‘আমি নভেম্বরে একটি উপন্যাস শুরু করেছি, নভেম্বর জুড়ে বেশ লেখা হলো।’ (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১)। শিবনারায়ণ রায়কে ০২.০৩.১৯৯৩ তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি জানান-“ ‘খোয়াবনামা’ নামে একটা উপন্যাস লিখছি ...এই লেখাটা ভালোই এগুচ্ছে।” (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১)। সাধন চট্টোপাধ্যায়কে ১০.০৩.১৯৯৩ তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, “গত বছরের শুরুতে ‘খোয়াবনামা’ নামে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করি। এর অল্প খানিকটা ছাপা হয়েছে চট্টগ্রামের ‘লিরিক’ নামে একটি লিটল ম্যাগাজিনে।” (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮)। মহীবুল আজিজকে ০৪.১২.১৯৯৪ তারিখের চিঠিতে ইলিয়াস জানান- “চট্টগ্রামের লিরিক আমার ওপর বিশেষ সংখ্যা করেছিল ... ঐ সংখ্যায় আমার উপন্যাস ‘খোয়াবনামা’র খানিকটা ছাপা হয়। গত আড়াই বছর ধরে আমি ওটা লিখছি। ...গত এপ্রিল থেকে দৈনিক জনকণ্ঠের সাপ্তাহিক সাহিত্যপাতায় ওটা ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে, এপর্যন্ত ২৩টি অধ্যায় বেরিয়েছে, আরো গোটা দশেক অধ্যায় চলবে।” (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২)। সাধন চট্টোপাধ্যায়কে ০৭.০৪.১৯৯৫ তারিখে লেখা চিঠিতে ইলিয়াস জানান - ‘আমার উপন্যাস খোয়াবনামা এখন শেষের দিকে, বলতে পারেন প্রায় নিকেশ করে ফেললাম। বড়ো কাজ, মানে সাইজে বড়ো। আর কোনোদিক দিয়ে বড়ো হবে বলে ভরসা হয় না। চরিত্রগুলোকে সবসময় নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। প্রথমে যে খসড়াটা ছিল দৈনিকের সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত হতে হতে তার অনেকটা পাল্টে গেছে, অনেক চরিত্র এসে শামিল হয়েছে। অনেক লোক অন্যরকম ব্যবহার করছে। জুন মাসে লম্বা ছুটি পাবো কলেজে, তখন ভাবছি মাসখানেক বগুড়ায় থেকে লেখাটা ফের নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা করব। একটু সম্পাদনা ছাড়া এটাকে বইয়ের আকার দেওয়া মুশকিল। আমার আর কোনো লেখা আমাকে এরকম ঝামেলায় ফেলেনি, এটা যে শেষ পর্যন্ত কি বস্তু হবে তাই নিয়ে বড়ো ভাবনায় পড়েছি সাধন।’ (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০)।

লেখকের সঙ্গে বিভিন্নজনের আলাপে উল্লেখিত হয়েছে, এ উপন্যাস লিখতে তিনি কত বিচিত্র উপাদানকে গ্রহণ করেছেন। সেখানে ইতিহাস, রাজনীতি, কিংবদন্তি, কৃষিবিজ্ঞান, পুথিসাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য তিনি শুধু বইপত্র ও সমসাময়িক দলিলের ওপরই নির্ভর করেননি, বারবার বগুড়ায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলো সম্পর্কে রীতিমতো গবেষণা চালিয়েছেন, সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেখানকার বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবিকার আন্তঃযোগ, সর্বোপরি সমষ্টিমানসের লোকজচেতনার স্বরূপকে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন স্থায়ী উপলব্ধিতে। কথাশিল্পী শাহাদুজ্জামান জানিয়েছেন, খোয়াবনামা-র সম্ভাব্য নাম ছিল ‘ভাবের ব্যারাম’। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতেই যে এ উপন্যাসের পরিকল্পনা ও খসড়ার কাজ শুরু করছিলেন, এর সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর সম্পাদিত সপ্তম ডায়েরিতে লিখিত বিভিন্ন অনুষঙ্গে। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫-৩০৭)। যেমন, জানুয়ারির ২৩ তারিখে তিনি দুচরণের যে শ্লোক লেখেন পাকুড় গাছ, মুনসি বয়তুল্লা শাহ ও গজার মাছের উল্লেখযোগ্যে, সেটি হুবহু স্থান পেয়েছে এ উপন্যাসের ‘৩’ পরিচ্ছেদে, তমিজের সৎ মা কুলসুমের দাদা চেরাগ আলির কণ্ঠে। তমিজের প্রসঙ্গে ডায়েরিতে লেখা

হয়েছে ‘ধান কাটতে গেছে থিয়ারে, এক মাস তার খবর নাই।’ তমিজের বাপ উপন্যাসের প্রথম পরিকল্পনাতেও যথারীতি নামহীন, তার রয়েছে একাধিক স্ত্রী। তমিজের মা (সৎ মা) কুলসুম সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য ‘স্বামীর প্রভাবে অস্বাভাবিক’। এসব প্রসঙ্গের রূপায়ণ খোয়াবনামা-তে লক্ষণীয়। ১৮ ফেব্রুয়ারিতে এ উপন্যাসের নামকরণ সম্পর্কে লেখেন ‘ভাবের ব্যারাম’। মূল উপন্যাসের ‘২৫’ পরিচ্ছেদে চেরাগ আলির গানে এ শব্দবন্ধের উল্লেখ রয়েছে –

আমার হইলো ভাবের ব্যারাম।

এই ব্যারামের নাইকো আরাম গো ও ও ও! (পৃ. ৫০৯)

২. এ উপন্যাসের পটভূমি প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন –

খোয়াবনামার সময়সীমা ১৯৪৪-১৯৪৮। দেশভাগের অব্যবহিত আগের ও পরের দেশের রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি। রানী ভবানীকে মনে আছে তো। সে সময় সবচেয়ে সেন্সেবল জমিদার। ...ফকির মজনু শা চিরদিন বলে এসেছে, – আমাদের লড়াই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে। রানী ভবানীকে মজনু শা চিঠি দিয়েছিলেন– আপনি আমাদেরও রানী। উনি কোনো উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। ...বগুড়া জেলায় পূর্বাঞ্চলে আমাদের যেখানে বাড়ি, সেই অঞ্চলে যারা বসবাস করত, তার সত্তর ভাগ এসেছে ফকিরদের সঙ্গে। ১৭৬৬ সালে মিরকাশিম যখন হেরে যান তার পলাতক সৈন্যবাহিনীর সেনানীরা যোগ দিলেন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। অবাক লাগে তাই না। ... ফকির বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দুটো আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে নিম্নবর্গের মানুষের কাছ থেকে। কোনোভাবেই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়। ... আমার বারবার মনে হয়েছে নিম্নবর্গের মানুষ গোটা বাংলায় কোনো না কোনো সময়ে বিদ্রোহ করেছে। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪)

এ প্রসঙ্গে আরো কিছু ঐতিহাসিক তথ্য হলো –

ক. মন্বন্তরের থাবা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে বাংলা-বিহারে। ... ১৭৭০ সন থেকে পুরো তিন বছর মন্বন্তর ও তার নিষ্ঠুর অভিঘাতে লক্ষ-লক্ষ মানুষ হয় মরলো কিংবা অর্ধমৃত হয়ে বেঁচে রইলো। ... এই সময় মাদারি ফকিরদের নেতা মজনুশাহ দিনাজপুরে বারবার আক্রমণ চালিয়ে কিছু মানুষের মনে ও কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। মজনুশাহের আদিনিবাস ছিল কানপুরের কাছে মাখনপুরে। সম্ভবত ১৭৭১ সনের প্রথমদিকে তিনি পূর্ণিয়ার ভেতর দিয়ে সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবেশ করেন। কোম্পানির প্রতিবেদন অনুযায়ী মহাস্থানগড়ের বিখ্যাত দরগায় যাবার সময় লেফটেন্যান্ট ফেলডাম তার গতিরোধ করে। কোম্পানির বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে মজনুশাহ ও তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। ফেলে যায় দশজন নিহত ও সাতজন বন্দীকে। (নিখিল সুর : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, উদ্ধৃত, আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, ৫২৪)

খ. মজনু শাহ, মুনসি বরকতুল্লাহ শাহ, ভবানী পাঠকের কথা, ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধের লোকমুখে প্রচলিত বয়ান নানাভাবে নানা জায়গায় এসেছে এই উপন্যাসে। অবশ্য কোথাও বিস্তারিতভাবে, ঘটনার সন-তারিখ মিলিয়ে বলা হয়নি,

ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায়ও সেরকম ছিলো না। কিন্তু সচেতন পাঠক ঠিকই বুঝে নেন ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনি; লোকজীবনে তার অভিঘাতের প্রতিই লেখক বারেবারেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। ১৭৬০ সালে বাংলার বুকে ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) কারণে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংঘটিত এই বিদ্রোহ আরও তীব্রতা পায়। ১৭৬৩ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় এই বিদ্রোহ দাবানলের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই ফকির-বিদ্রোহের নেতা ছিলেন মজনু শাহ, আর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠক। এই উপন্যাসে বারবার যে মুন্সি'র প্রসঙ্গ এসেছে, তিনি হচ্ছেন বরকতুল্লাহ শাহ, যিনি ইংরেজের গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেও, লোকমুখে 'জীবিত' হয়ে অন্য-এক মিথে পরিণত হন ... এমন এক নিশিচারীর (তমিজের বাপ) সন্ধান দিচ্ছেন ঔপন্যাসিক, যে কিনা নিজের জীবনের সঙ্গে ওই মিথের সত্যতা বহন করে চলেছে। (সৌভিক রেজা, কথাসিঙ্গের কথা, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৮২)

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে দ্রষ্টব্য : আনন্দ ভট্টাচার্য, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ : ইতিহাসের পুনর্বিবেচনা, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০)

৩. এ উপন্যাসে লেখক স্থায়ী ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক উত্তরাধিকারকেও সম্পৃক্ত করেছেন। বগুড়া জেলার যে দুটি গ্রামকে তিনি এ উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এ প্রসঙ্গে জানা যায়—

ক. যে গ্রামটা নিয়ে লিখেছি ... গ্রামটা আমার খুব চেনা। এটা যদিও আমাদের গ্রাম নয়। আমাদের গ্রামটা আরো ভেতরে। আমার ঠাকুরদা বগুড়া চলে এসেছিলেন। এই গ্রামটি বগুড়া থেকে বারো মাইল ভিতরে। বাসে যেতাম, খুব ঘুরেছি। খুব বাজে রাস্তা। ... (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭)

খ. বই লেখার তাগিদে আমাদের বগুড়ার গ্রামে আমার খুব যেতে হয়। আর আমি তো গ্রামেরই লোক। বগুড়ার গ্রামগুলোতে আমি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি, নিম্নবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণেরও বটে - ... তাদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মুসলমানের সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনেক কম। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৪)

সমালোচক জানিয়েছেন —

বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবাদ-প্রতিম শিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তাঁর অন্যতম সৃষ্টি ... খোয়াবনামা। এর ... ভিত্তিভূমি হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন পিতৃভূমি বগুড়া জেলার গাবতলী থানার ৮/১০ মাইল পূর্বের কাৎলাহার নামের একটি বিলকে। এই বিলটির অবস্থান তাঁর বাপ-দাদার বাড়ির কাছে। এই কাৎলাহার বিল ও বিলপাড়ের সাধারণ মানুষজনের জীবনব্যবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণের মুন্সীয়ানায় আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ। ... ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার জন্যই কাৎলাহার বিল, বিলপাড়ের মানুষ ও মানুষের জীবন, পোড়াদহের মেলা, তরণীর হাট, গোলাবাড়ি হাট

ইত্যাদি স্থান স্ব-চক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হই। কাৎলাহার বিলপাড়ের দুই গ্রাম রানীরপাড়া ও পার-রানীরপাড়ায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে টেপেরেকর্ডারে ধারণ করি। (মোস্তফা মোহাম্মদ, ‘কাৎলাহার পর্ব : মুন্শী আবেদ আলী’, সাহিত্যে মনন-সৃজন ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৫-৮৮)।

৪. মহীবুল আজিজকে ০৪.১২.১৯৯৪ তারিখে লিখিত চিঠিতে লেখক জানিয়েছেন, এ উপন্যাস লিখতে গিয়ে তাঁর বিস্তর ক্লেশ গ্রহণ ও বিপুল আঁকর সমাবেশের ইতিবৃত্ত—

১৯৪৫-৪৭ এর বাঙলার গ্রামের পটভূমিতে লিখতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, অনেক কিছু জন্মে নির্ভর করতে হচ্ছে এই সময়ের কাগজপত্রের ওপর। আবার প্রধান লোকজন সব চাষা আর জেলে, তাদের সেই সময়ের মনস্তত্ত্ব বোঝা কি সোজা কথা? শুরু করে আটকে গিয়েছি, তাদের একটা গতি তো করতে হয়। আমাদের গ্রামের কাছাকাছি একটা গ্রামের মিথ খুব ব্যবহার করছি ধুমসে, ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। একেকটা অধ্যায় লিখতে জান বেরিয়ে যায়, তবে জান নিয়ে টানাটানি যেখানে বেশি, সেখানে সুখও বেশি। এখন একটা টাফ অবস্থায় আছি, কি যে হয় সেই ভাবনায় কাতর। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২)

৩০.১০.১৯৯৪ তারিখে বিষ্ণু বসুকে চিঠিতে ইলিয়াস জানান —

আমার উপন্যাস ‘খোয়াবনামা’ ছাপা হচ্ছে এখানকার একটি দৈনিকের সাপ্তাহিক সাহিত্যের পাতায়। এই লেখাটা আমাকে দারুণ ভোগাচ্ছে। আমার মস্ত মস্ত তিনটে ডায়েরিতে যেসব নোট করেছিলাম তার বেশির ভাগই অগ্রাহ্য করে আমার বাহাদুর চরিত্ররা যা তা করে বেড়াচ্ছে। আমার স্কিম ভেঙে যাচ্ছে, আমি অসহায়ের মতো এই ভাঙন পরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন করছি। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫)

কথাশিল্পী শাহাদুজ্জামান জানিয়েছেন এ উপন্যাস রচনাকালে তাঁর সঙ্গে লেখকের আলাপের খানিকটা স্মৃতিকথা— “মনে পড়ছে ‘খোয়াবনামা’ রচনার প্রস্তুতিপর্বের একটু আধটু। ... উত্তেজনায় বারবার নিভে যাচ্ছে পাইপ, তিনি বর্ণনা করছেন, বগুড়া থেকে চল্লিশ দশকের দুর্লভ কিছু পত্রিকা উদ্ধারের কাহিনী। টেবিলের উপর ছড়িয়ে আছে ফকির বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন নিয়ে বিস্তর বই, বাজার চলতি খোয়াবনামাও” (উদ্ধৃত, আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭)। অগ্রজ লেখক শওকত আলী জানিয়েছেন, এ উপন্যাসের প্রয়োজনে লেখক তাঁর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আলাপ করেছেন এবং সে সময়ে তাঁর মনোভঙ্গি —

ইতিহাস আর নৃতত্ত্ব যেন তাঁকে পেয়ে বসল — সেই সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বও। প্রায়ই বাড়ি যেতেন, বগুড়ায়। আর ওখানে গেলেই চলে যেতেন ‘মহাস্থানগড়’ এলাকায়। প্রাচীন মূর্তি, টেরাকোটার বিষয় এবং ফিগার, দালানের ভিত-এর নকশা, ইটের সাইজ, এসব তো লক্ষ্য করতেনই। আরও বেশি লক্ষ্য করতেন ওই এলাকার লোকজনের মুখের ভাষাভঙ্গি, আচার আচরণ, নামের বৈশিষ্ট্য, পদবির বৈচিত্র্য এইসব। নতুন কিছু চোখে পড়লেই ঢাকায় ফিরে এসে আমাকে জানাতেন। ... একদিন এসে মাদারি ফকিরদের সম্পর্কে কী জানি জানতে চাইলেন। যা জানি বললাম, কিন্তু পরে দেখি

উনি আমার চাইতেও বেশি জেনে ফেলেছেন। আবার একদিন এসে জিজ্ঞেস করলেন, গিরি কাদের পদবি? নিশ্চয়ই সাধু সন্ন্যাসীদের? আমার যে অভিজ্ঞতা অন্যরকম, জানালাম সেটা। বললাম, কুড়িগ্রাম, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং নেপালের ভেতরেও অনেক মুসলমানের নামের পেছনে গিরি পদবি দেখতে পাওয়া যায়। সেই সূত্রে তাঁদের বগুড়া অঞ্চলে গিরডাঙ্গা গিরিরডাঙ্গা নামগুলোর প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহাসিকতা আরও বোঝা গেল ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গে ওই গিরিদের সম্পর্ক কী এবং কেমন ছিলো। ... নিরলসভাবে জীবনকে তার মর্মমূলে পর্যন্ত খোঁজার এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার স্বভাব অর্জন করেছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। যার ফলে সম্ভব হয়েছে খোয়াবনামার মত কালজয়ী একখানি উপন্যাস লেখা, যা সকল বাংলাভাষীকে বহুকাল ধরে তৃণমূলের মানুষকে চিনতে এবং জানতে সাহায্য করবে। ('ইলিয়াস : মিল অমিলের প্রিয়জন', শওকত আলীর প্রবন্ধ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১১৪)

৫. মাকানপুরের সুফিসাধক শাহ বহিউদ্দীন মাদারের অনুসারীরা মাদারি ফকির হিসেবে পরিচিত। শাহ মাদারের (জন্ম : ১৩১৫ খ্রিস্টাব্দ) পিতা ও পূর্বপুরুষ ইহুদি ছিলেন। মদিনায় গিয়ে তিনি ইসলাম ধর্মে আত্মহী হন। মদিনা থেকে তিনি একপর্যায়ে ভারতের গুজরাটে আসেন। শাহ মাদারের শিষ্যরা মনে করেন, তিনি সরাসরি হজরত মহম্মদের (সঃ) কাছ থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিয়েছেন। তাঁর জীবনধারায় সিয়া-সুন্নী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। তিনি চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরে পরিভ্রমণরত অবস্থায় মাদারি মতবাদ প্রচার করেছিলেন বলে কথিত আছে। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং মহৎ ধর্মপ্রচারক ছিলেন, তার অনুসারীরা এরূপ ধারণা পোষণ করত। ভারতীয় উপমহাদেশে আগত বিভিন্ন পীর-দরবেশ, ফকিরদের মধ্যে মাদারি ফকিরদের অবস্থান যে লোকায়ত সংস্কৃতিতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ প্রসঙ্গে আনন্দ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মাদারী পীরকে কেন্দ্র করে যে লোকায়ত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে অন্যান্য সুফিদের নিয়ে সে ধরনের চিন্তাভাবনা লক্ষ করা যায় না।' [উদ্ধৃত, আলাউদ্দিন মণ্ডল, 'খোয়াবনামা-য় মরমি অভিভব এবং মাদারি ফকির প্রসঙ্গ', মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), উষালোকে, নব পর্যায় অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১৪৪]। সতের শতকের মধ্যভাগ থেকে উত্তরবঙ্গে মাদারিদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সাংসারিক পরিমণ্ডল ছেড়ে দরগাকেন্দ্রিক জীবনচালায় তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। উরস থেকে অর্জিত অর্থেই মাদারি সম্প্রদায়ের আর্থিক ভিত্তি মজবুত ছিল। মাদারি ফকিরদের দরগা সংলগ্ন এলাকার গ্রামবাসী অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করত। এই অর্থ দানকে কেন্দ্র করেই বাংলার জমিদার ও কৃষকদের সঙ্গে ফকিরদের দ্বন্দ্ব আঠারো শতকে চরমে উঠেছিল। (এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত জানতে পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

৬. খোয়াবনামা উপন্যাসের আখ্যানগত পটভূমি নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নেপথ্যে উপস্থিত রয়েছে। উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে এ বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফকিরকুঠির (রংপুর) দেওয়ানি গ্রহণ করে এবং দেবী সিংকে এর ইজারাদার পদে নিয়োগ দেয়। তার

বিবিধ অত্যাচারের প্রতিবাদে কৃষকেরা ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সমকালে সংঘটিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ অভিঘাতে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এরই পরিণতিতে কৃষকেরা পরিণত হয় দস্যুতে, যারা বিভিন্ন সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিয়েছিল। এদেরই একজন ‘কৃপানাথ’ নিজের বিরাট দল নিয়ে পঞ্চগড়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আস্তানা গড়ে তোলেন। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। ভবানী পাঠকও ছিলেন সন্ন্যাসীদের অন্যতম। মাদারি ফকির সম্প্রদায়ও একপর্যায়ে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এ বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ হলেন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, ইমামবাড়ি শাহ, জয়রাম, জহুরীশাহ, দর্পদেব, বুদ্ধশাহ, মজনুশাহ, মুসা শাহ, রামানন্দ রগাঁসাই, সোভান আলী প্রমুখ। এদের বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাসীগণ প্রথম বর্ধমান জেলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে সম্পৃক্ত হন। তবে একপর্যায়ে ভবানী পাঠক ও দেবীচৌধুরাণীর দলের সন্ন্যাসীরা ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত হন ও মৃত্যুবরণ করেন। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ইংরেজদের কাছে অভিযোগ আসে যে, ভবানী পাঠক নামে এক ব্যক্তি তাদের নৌকা লুট করেছে। লেফটেন্যান্ট ব্রেনোর নেতৃত্বাধীন অভিযানে ভবানী পাঠক মারা যান। অন্যদিকে পঞ্চগড় ও জলপাইগুড়ি এলাকাসহ উত্তরবঙ্গে ফকির বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন মজনু শাহ। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহকে দমন করার জন্য দিনাজপুর ও রংপুরে পাঠানো হয় অতিরিক্ত ব্রিটিশ সৈন্য ও দেশীয় সিপাহী। পরের বছর তাঁর নেতৃত্বে ফকিরগণ বগুড়া, রংপুর, জলপাইগুড়ি, বৈকুণ্ঠপুর, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় আক্রমণ চালায়। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর মজনু শাহ পাঁচশত সৈন্যসহ বগুড়া জেলা থেকে পূর্বদিকে যাত্রা করার পথে ‘কালেশ্বর’ নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। এতে তিনি মারাত্মক আহত হয়ে অবশেষে ‘মাখনপুর’ নামক স্থানে মারা যান। মজনু শাহের মৃত্যুর পর তার ভাই মুসা শাহ দলের নেতৃত্ব দিলেও ১৮০০ সাল নাগাদ এ বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে দমন করে। (নাজমুল হক, পঞ্চগড় জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৪-৮৮)

৭. তপোধীর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন –

ফুলজান ও সখিনা এভাবে কেবল সময়ের বাসিন্দা হয়ে থাকে না, ক্ষুণ্ণপীড়িত নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যজনের খাঁটি প্রতিনিধি হিসেবে মহাসময়েরও চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে। যখন ফুলজানের অনুভূতিতে সখিনার চুপ হয়ে-যাওয়া অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের অনুষ্ণে গৃহীত হয়, আমরা লক্ষ করি, উপন্যাসে খণ্ডসময়ের মধ্যে মহাসময়ের ধারাবাহিকতা : ‘কিন্তু বেটি তার এরকম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? ... তমিজের বাপ নিশ্চয়ই তার ওপর আসর করে নাতনির মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার জানা অজানা মুনসির পাওনা শোলোক।’ ইলিয়াস এই সংকেত দিচ্ছেন যে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের অভিজ্ঞতা ও অবস্থানজনিত দূরত্ব যতই বাড়ুক না কেন, যৌথ নিশ্চেতনায় সঞ্চিত থাকে কৌম অনুভূতির প্রত্নস্মৃতি যা জীর্ণও হয় না হারিয়েও যায় না পুরোপুরি। (উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৮৫)

৮. এ উপন্যাস সম্পর্কে তিনজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকের অভিমত -

ক. আমি বিশ্বাস করি, কি পশ্চিমবাংলা কি বাংলাদেশ সবটা মেলালে তিনি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক। আমার চেয়ে অনেক বড় লেখক। [মহাশ্বেতা দেবী, তৃণমূল, আনু মুহাম্মদ (সম্পাদিত), ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৭]

খ. গত কয়েক বছরে (এ প্রবন্ধ ১৯৯৭ সালে লিখিত) নোবেল পুরস্কার পেয়ে যাঁরা একালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন-এমনকি নোবেল পুরস্কার না পেয়েও ... ইত্যাদি অসংখ্য সমকালীন লেখকদের পাশাপাশি বাংলাভাষার লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে জায়গা দিতে আমি এতটুকু হীনম্মন্যতা বা অতিশ্লাঘাবোধে ভুগি না। আমার কাছে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। ... চিলেকোঠার সেপাই-এর পর নয়, খোয়াবনামার পরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে আমি সমকালীন পৃথিবীর প্রধান লেখকদের একজন বলে মনে করি ... তাঁর তিন দশকের লেখকজীবনে-পরিমাণে তা কতটুকুই-বা, কিন্তু আমি মনে করি-অনেকটা দূর পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গী হতে পারবেন। (হাসান আজিজুল হক, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : স্বপ্নছায়াকল্পনার মূর্ত বাস্তব', বাংলা কথাসাহিত্যে কয়েকজন : মগ্ন অবলোকন ও সামান্য বিচার, চারুলিপি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১২৬-১২৭)

গ. 'খোয়াবনামা' একা দৈত্যের মত ... বেনো প্লাবনের মুখে পা গেড়ে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ রচনা করেছে। অধিকন্তু, একটা অস্তিত্বচক বিকল্প দুর্গপ্রাচীর খাড়া করেছে। কাৎলাহার বিলকেন্দ্রিক একটি বিশাল জনপদ, তার বহুরঙা নরনারীর পোড় খাওয়া মচকে যাওয়া অবয়ব ও অন্তহীন স্বপ্নজীবী মনোজগৎ, দূর নাগরিক ঔরসে জাত রাজনৈতিক আন্দোলনে টোল খাওয়া সম্পর্কগুলোর মফঃস্বলী দ্বন্দ্বক্রিয়া, শ্রেণীগুলির ট্র্যানজিশনাল ঘাতপ্রবণতা ও ট্র্যাডিশনাল ঘাতসহ নির্বেদী স্বভাব, প্রতিটি ব্যক্তি যেখানে নিজের নিজের ডিটেইল মনস্ক্রিয়ার লেনদেনে ও পারস্পরিক টানাপোড়েনে ক্রমবিকাশমান অথচ প্রত্যেকে তারা সমগ্র মানব অস্তিত্বের মূল সংস্থানে সূক্ষ্ম সূত্রবন্ধনে শরীক, ইতিহাস ও ভূগোল যেখানে বেণীবদ্ধ অবস্থায় অবিভাজ্য কালশরীরে ত্রিকালিক বিভাজনচিহ্ন দেগে দেয়, যেখানে আবহমানকালীন লোকসংস্কৃতি সম্পূর্ণ আধুনিক রূপকার্থে এক বৈপ্লবিক যুগভাষ্য ধারণ করে, শেষ পর্যন্ত অনাগত কালের গর্ভে নতুন প্রজন্মের সূচনাইংগিত; এত বড় এপিক ও প্যানোরমিক উপন্যাসপ্রয়াস বাংলাদেশের সাহিত্যে নজিরবিহীন। মাত্র একটি গ্রন্থের জোরেই আমাদের গার্হস্থ্য উপন্যাসসাহিত্যের গণ্ডি তচনচ করে কী ভীষণ আন্তর্জাতিক করে দিয়ে গেলেন ইলিয়াস! (আবুবকর সিদ্দিক, সাহিত্যের সংগপ্রসংগ, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬২-১৬৩)

৯. এ আলোচনায় ব্যবহৃত উপন্যাসের সকল উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র ২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২। উদ্ধৃতির পাশে গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা বন্ধনীতে নির্দেশিত।

১০. এ উপন্যাসের নামকরণ এবং আখ্যান সম্প্রসারণের অন্যতম অবলম্বন স্বপ্ন। এ সম্পর্কে লেখকের প্রাসঙ্গিক অভিমত –

খোয়বনামায় ফ্যানটাসিটা অনেক বেশি। একটা গোটা কমিউনিটি স্বপ্ন দেখছে। শুধুমাত্র তমিজের বাপ একা নয়। খেত মজুর না হয়ে তমিজ বর্গা চাষি হবে এই অবধি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ... আমি চেয়েছি কমিউনিটিকে সামনে আনতে। যেমন তমিজের বাপ। যে মানুষটি কখনো সামনে আসে নি- চেরাগ আলি- তারও স্বপ্ন আছে। কেরামত আলি একজন আছে সেও স্বপ্ন দেখে। ... গোটা কমিউনিটির খোয়াব দেখাতে গিয়ে আমি ফ্যানটাসিতে চলে এসেছি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যকার নিজস্ব ধর্ম, সেখানকার মিথ নিয়েই তো অ্যাসোসিয়েট মানুষ। আমাদের জীবন তো স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটছে। ... মানুষ স্বপ্ন দেখে, চাষিরা, কামাররা এরপরেও স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন না দেখলে বাঁচার কোনো আশা থাকে না। ... স্বপ্ন ভাঙে, নতুন করে স্বপ্ন তৈরি হয়। সেটাও ভাঙে। কিন্তু স্বপ্ন দেখা তো থেকেই যায়। না হলে এরা বাঁচবে কীসের হাত ধরে। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬)

১১. বাংলা ব্যাকরণে সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত ‘অপর’ শব্দ বহুমাত্রিক অর্থবিশিষ্ট এবং পৃথিবীর প্রচলিত ভাষাসমূহে এর অন্তিষ্ঠ ক্রিয়াশীল। এ শব্দটি সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনায় সবিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে অর্থের বিশিষ্ট প্রয়োগের সামর্থ্যগুণে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ-য়ে ‘অপর’ শব্দের অর্থ হিসেবে অন্য, ভিন্ন, পৃথক, ইতর, অর্বাচীন, নিকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, অন্যজাতীয়, প্রতিকূল, বিরোধী, শত্রু ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণীয় যে, শব্দটির অর্থসমূহে রয়েছে ব্যবধান বা দূরত্ব, অনন্বয়সূচক মনোভঙ্গি। প্রকৃতঅর্থে, ‘অপর’-সম্পর্কিত ভাবনার আশ্রয় হলো ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত প্রেক্ষাপট। সমাজ-অন্তর্গত যে কোনো ব্যক্তি কেন্দ্র-প্রান্তের আলোকেই নিজস্ব মূল্যায়নে বাধ্যগত। যে কেন্দ্র থেকে যত দূরে অবস্থান করে, প্রান্তিকতার কারণে তার মধ্যে হীনম্মন্যতাবোধ তত বেশি সক্রিয়। অন্যদিকে যে কেন্দ্রাভিগ অবস্থানের অধিকারী, অন্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রকাশের সুযোগ ও আধিপত্যবাদী মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই তার আচরণ, চিন্তায় বিস্তৃতিলাভে সক্ষম হয়। সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগত বিপ্রতীপতা ও সংঘাতের অনিবার্যতাই কেন্দ্র-প্রান্তের মধ্যবর্তী অবস্থানে বিরাজমান অপরতাবোধের নিয়ামক শর্ত। এর সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতা, অন্যের ওপর কর্তৃত্বশীলতার অভিপ্রায়, আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে অন্যের সমীহ আদায়ের অভীক্ষা প্রভৃতিও সামাজিক শক্তির ধারক-বাহক হিসেবে কেন্দ্র-প্রান্তের সম্পর্কগত বিন্যাসকে ক্রমশ জটিল করে তোলে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত –

‘পর’কে যদি ‘আত্ম’র শাসনভুক্ত, শর্তসাপেক্ষ করে তোলা যায়, ‘পর’কে যদি ‘আত্ম’র ছাঁচে সাজিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সেই ‘পরে’র স্বাভাব্য লোপ পেতে বাধ্য। ঐ আত্মীকৃত আদল বা নির্মিতি তাকে পরিণত করে ‘আত্ম’র এক প্রক্ষেপে, প্রতিবিম্বে। ‘পর’ তখন আর ঠিক পর থাকে না, পৃথক কোনো সত্তায়, নিজস্ব কোনো সংজ্ঞায় তাকে শনাক্ত করা যায় না; ‘পর’ হয়ে ওঠে ‘আত্ম’র উৎক্রম (ইন্ভারশান),

সবয়ব প্রত্যক্ষতা হারিয়ে মনগড়া, বিমূর্ত ধারণা কেবল। আত্মকেন্দ্রিক এই চিহ্নব্যবস্থায় ‘পর’ কখনই বিষয়ীর মর্যাদা পায় না, নিছক বিষয় থেকে যায়। ... আত্মীকরণ, আত্মসাৎ-এর এই কৃৎকৌশল আত্মকে জোগায় একধরনের নিরাপত্তা; তার অন্তর্বিদ্যাসের শৃঙ্খলা বা সংগতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলবার আর দরকার পড়ে না, ... ‘আত্ম’ যেহেতু ‘পরে’র মুকুরেই নিজেকে দেখতে চায় তাই নিজের কাছেও তার পরিচয় মূলত নেতিবাচকই থেকে যায়—উৎক্রমের উৎক্রম ঘটিয়েই কেবল পৌঁছোনো যায় আত্ম-কেন্দ্রে, এমন এক কেন্দ্রে, আদতে যা ফাঁপা এবং ফাঁকা। (শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৮-৯)

১২. এ উপন্যাসে ব্যবহৃত কিংবদন্তি সম্পর্কে লেখক বলেছেন –

ক. ফকির বিদ্রোহের এক সৈনিক মারা গিয়ে পাকুড় গাছের ওপর জিন সেজে বসে আছে। বারবার তমিজের বাপ সেখানে যাচ্ছে। যদি ওর সঙ্গে (জিন) দেখা মেলে, তাহলে দুর্দশা কেটে যাবে। কথাটা খুব স্পষ্টভাবে বলা নেই। খুব স্পষ্টভাবে ভাববার ক্ষমতাও নেই। বোকা টাইপের মানুষ। লোকটা স্বপ্ন দেখে ভাগ-চাষি হওয়ার। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫)

খ. একটা গাছ আছে। গাছকেই বিশ্বাস করতে চায়। depend করতে চায় সেটার উপর, – মানে গাছটাতে বলতে পারো ঈশ্বর-টিশ্বর বা দেবতা-টেবতা কিছু আছে। ... জিনটাই তো দেবতা আর কি। ... পরের প্রজন্মের একজন হারিয়ে যায়। তারপর একদিন সবাই জানতে পারে গাছেই উনি আছেন। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১-১১২)

১৩. এ প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন –

ক. আমি চেয়েছি কমিউনিটিকে সামনে আনতে। যেমন তমিজের বাপ। যে মানুষটি কখনো সামনে আসে নি – চেরাগ আলি – তারও স্বপ্ন আছে। কেরামত আলি একজন আছে সেও স্বপ্ন দেখে। সে কবিতা লেখে। গ্রামের কবিতা লেখে। পার্থক্য হচ্ছে চেরাগ আলিকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই কবিতা তুমি বাঁধলে? তবে সে অসম্ভব হয়। বলে কবিতা কি বাঁধার জিনিশ! আমরা কবিতা বাঁধি না এসব আমরা পাই। রেগে যেত। ওর কাছে বিষয়টা ঐশ্বরিক ব্যাপার। কেরামত আলি বলে আমি কবিতা বাঁধি। সে গ্রামের কবি কিন্তু আধুনিকতামনস্ক। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬)

খ. মেলায় গিয়ে কেরামত আলি যে গানটা গাইছে একটু একটু অশ্লীল। সেই গানটা পুরোটাই আমি ওদের ওখান থেকে নিয়েছি। ... বিশ বছর আগে যখন গ্রামে যাই, তখন কিন্তু মনে হয়নি গ্রাম আমার মধ্যে পরিণত হচ্ছে। আমি বহু পদ ওদের মধ্যে থেকে নিয়েছি ... নিম্নবর্গের যে কথা আছে তা আমি ইচ্ছা করে যে নিয়ে এসেছি তা

নয়। বরং বলা যায় চলে এসেছে। আর এভাবে চলে না আসলে বুঝি উপন্যাসটাও দাঁড়ায় না। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭)

সমালোচকের অভিমত –

কেরামতের বাঁধা গান তেভাগার গান, সংগ্রামের গান, তাতে কোনো কুয়াশা নেই। কিন্তু ফকিরের গানে কাল পরম্পরায় সভ্যতা, জীবন পরিবর্তনের কথা। কিন্তু কুয়াশা জড়ানো। চেরাগের আর একটি গান থেকে আমরা জানতে পারি– ‘আমার হইলো ভাবের ব্যারাম।/এই ব্যারামের নাইকো আরাম, গো ও ও ও!’ শিল্প কিংবা সংগ্রাম-দুটি ক্ষেত্রেই এই ‘ভাবের ব্যারাম’-এর কথা পাঠক জানেন। আবার আর একটু পরে লেখক জানান-চেরাগ আলির নামে যে গান চলে আসছে সেটাই বা কে কবে বেঁধেছিল তাও জানা যায় না। অর্থাৎ কাল পরম্পরাবাহিত যে গান, যা মানুষকে বাঁচায়, দুঃখের সাথী হয়ে ওঠে। (রবিন পাল, উপন্যাস : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১১ পৃ. ১৪৯)

১৪. আনন্দ ভট্টাচার্যের প্রাসঙ্গিক অভিমত –

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ (১৮৮২) লেখার তাগিদে অবশ্যই হান্টার বর্ণিত ঐতিহাসিক উপাদানকে কাজে লাগিয়েছেন। যদিও হান্টার বলছেন যে তিনি গ্রামবাংলার কাহিনী বর্ণনা করতে ব্যস্ত কিন্তু তাঁর আলোচনা মূলত বীরভূম, বিষ্ণুপুর বা সামগ্রিক অর্থে দক্ষিণবঙ্গকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। হয়তো এই চিন্তাভাবনার তাগিদে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ-এ বর্ণিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হিসাবে উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের বদলে বীরভূমকে বাছা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল মাত্র বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছেন তাই নয়, তিনি বিদ্রোহীদের যে বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন তার সঙ্গেও ইতিহাসের বিস্তর পার্থক্য। এমনকি আনন্দমঠ-এর প্রথম দুটি সংস্করণের সঙ্গে তৃতীয় সংস্করণের বিষয়বস্তুর বিস্তর প্রভেদ। সম্ভবত রাজরোষ থেকে বাঁচবার জন্যই তাঁকে এই পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকাকে হাজির করেছেন সে ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ মেলে। তিনি বিদ্রোহের সন্ন্যাসী বলতে যাদের হাজির করেছেন তারা নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিত ও অনুশীলন তত্ত্বে বিশ্বাসী একদল সন্তান যারা স্বদেশসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। ... বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন যে আনন্দমঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপট অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় যেহেতু এটা লেখা এবং বেশ কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রের সন্ধান দিয়েছেন এবং তার চেয়ে বড় কথা, ঐতিহাসিক ঘটনা অর্থাৎ সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে উপস্থিত করেছেন তাই বেশ কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে যার ফলে প্রশ্ন ওঠে “সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিভিল না” – সত্যানন্দ কে এবং তিনি কোন আগুন জ্বালিয়েছেন যা নেভেনি। সত্যানন্দকে

যে সন্তান বলে অভিহিত করা হচ্ছে তার সঙ্গে ইতিহাসের সন্ন্যাসীদের কোনও মিল নেই। (পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১২)

১৫. এ প্রসঙ্গে গবেষক জানিয়েছেন –

আদি মধ্যযুগে ... যমুনার উল্লেখ পাই ধোয়ির ‘পবনদূত’ কাব্যে, ... এরপর ... মধ্যযুগের ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে। আবুল ফজল সেখানে বর্ণনা দিয়েছেন It is divided into three streams; one the Sarsuti (Saraswati); the second the Jamuna (Jamuna) and the third the Ganges, called collectively in the Hindi Language. Tribeni, and held in high veneration.” রেনেলের মানচিত্রে যমুনা ক্ষীণকায়া। ... ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্প যার ফলে গোড়ের কাছে গঙ্গার খাত পরিবর্তন হয়। তার আগে কিন্তু যমুনা বেগবতী – এমন বর্ণনাই পাই বিপ্রদাসের ‘মনসাবিজয়’ কাব্যে ... সুতরাং যমুনার শাখা পদ্মাও তখন বেগবতী ছিল ... পদ্মার পতনের মূলে হয়তো ২ এপ্রিল ১৭৬২-র ভূমিকম্প বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। এই ভূ-কম্পনের ফলশ্রুতিতে বঙ্গ ও মায়ানমারের ভূস্তর উঁচু হয়ে ওঠে এবং পদ্মার জলধারা অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এছাড়াও ১৮শ শতকে দামোদর তার খাত পরিবর্তন করে বর্তমান পথে প্রবাহিত হতে শুরু করে, যার ফলে যমুনার সঙ্গে তার শাখা নদী পদ্মারও পতন ত্বরান্বিত হয়। ... ধ্বংসস্তুপ থেকে পদ্মার দূরত্ব বর্তমানে ... প্রায় তিন মাইল। কিন্তু পরবর্তীকালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বিদ্যাধরী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জি একে যমুনার তীরে বলে বর্ণনা করেছেন। সাম্প্রতিক কালে ১৯৯৩ সালে Zoological Survey of India এই অঞ্চলে যে সমীক্ষা চালিয়েছে তাতে এই নদীকে ... পদ্মা বিল বলা হয়েছে। ... কিন্তু বিল যে আদতে নদী ছিল তা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সমীক্ষা করা হয়েছিল চাঁদা গ্রামে ‘ল্যাব-টু-ল্যান্ড প্রজেক্টে’ তাতে এই নদী দিয়ে নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ চলাচলের তথ্য উঠে এসেছে ইংরেজ আমলে। ... ড. গৌরীশঙ্কর দে তাঁর ‘হাবড়ার কথা’ বইতে হাবড়া শ্যাম মার্কেটের নিকটে নীল রপ্তানির জন্য ঘাটের উল্লেখ করেছেন। যার অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান— ঘাট ধ্বংসস্তুপে পরিণত, কিন্তু খালটিও এখনও বিদ্যমান। [শংকর রঞ্জন মজুমদার, ‘যমুনা ও শাখা নদী পদ্মা-সংলগ্ন অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি’, লোক : বাংলার নদনদী, জলাশয় ১, প্রণব সরকার (সম্পাদিত). কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩৬৪-৩৬৭]

ঐতিহাসিক তথ্য ও বৃত্তান্তের সঙ্গে খোয়াবনামা-য় বিবৃত যমুনা নদীর খালে রূপান্তরিত হওয়ার কিংবদন্তির প্রতিতুলনা করলে বোঝা যায়, লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে নিজেই এ কিংবদন্তি রচনা করেছেন। লোকমানসে বিভিন্ন কিংবদন্তি যুগ যুগ ধরে প্রজন্মান্তরে প্রচলিত থাকে। মাদারি ফকিরদের সম্পর্কে লোকসমাজের ভক্তি, সমীহা এবং বিশ্বাস গড়ে তুলবার সহায়ক উপাদান হিসেবেই লেখক এ উপন্যাসে চেরাগ আলি ও তমিজের বয়ানে দুটি পৃথক কিংবদন্তিকে উপস্থাপন করেছেন। চেরাগ আলি নিজেও মাদারি ফকিরের বংশধর বিধায় তার পূর্বপুরুষদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কিত বৃত্তান্ত উপস্থাপনের তাগিদে কুলসুমকে এ কিংবদন্তি

শোনায়। জনৈক সর্দার পীরের অভিশাপে যমুনা নদী খালে পরিণত হয়। অন্যদিকে তমিজ তার মায়ের কাছ থেকে যে কিংবদন্তি শুনেছিল, তার প্রতিপাদ্য ছিল, যমুনা নদী খালে পরিণত হয়েছিল এবং খালটিই বাঙাল নদীর স্রোতধারায় মিশে কাংলাহার বিল গড়ে তোলে। এ ঘটনার সঙ্গে মুনসি বয়তুল্লা শাহের সম্পৃক্ততা থাকায় তা তমিজের মনোগহীনে রেখাপাত করেছিল। লক্ষণীয়, উভয় কিংবদন্তির সঙ্গে যুক্ত মূল ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ হিসেবে ভূমিকম্পের উল্লেখ রয়েছে। জানা যায়, ১৭৬২ সালে (তদানীন্তন বার্মা) মায়ানমারে সংঘটিত ভূমিকম্পে বাংলাদেশেও ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। লেখক এ প্রসঙ্গের সঙ্গে উপন্যাসে বিবৃত দুটি কিংবদন্তিকে সংযুক্ত করেছেন লোকসমাজের কল্পনা, ধর্মীয় ভাবপরিমণ্ডল ও চেতনালোকের রূপরেখা ফুটিয়ে তোলার তাগিদে।

১৬. আহমদ ছফা স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন—

ইলিয়াস ভাইতো ‘খোয়াবনামা’ লিখতে আরম্ভ করেছেন। ... একদিন বললেন, ... এই যে মুসলমানরা যে পুঁথি সাহিত্য রচনা করেছেন তার কিছু নমুনা আমার প্রয়োজন। ... আপনি তো পুঁথি নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। এ বিষয়ে আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারেন কি না। আমি জানালাম, ইসলামপুর চলে যান। ওই সমস্ত দোকানে ইউসুফ জুলেখা, আমীর হামজা, জঙ্গনামা, শহীদে কারবালা, কাসাসুল আশিয়া এরকম অনেক ইসলামি বইয়ের পুঁথি কিনতে পাওয়া যায়। ... এ গ্রন্থে ... যে সকল পুঁথির পংক্তি কিংবা অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে সবগুলো ইলিয়াস ভাই নিজেই লিখেছেন। পুঁথিসাহিত্য আসলে মধ্যযুগীয় মানসফসল। ইলিয়াস ভাই পলাশীযুদ্ধ পরবর্তী সময়টাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে যেয়ে এই মধ্যযুগীয় মানস ছব্ব উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলো কোনো পুঁথি থেকে আহরণ করে তিনি উদ্ধৃতি হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন বলা হলে, খুব কম পাঠকের মনে কোনো রকম সন্দেহ জন্মাবে। ... এ থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব, ইলিয়াস ভাই কতো সতর্কতার সঙ্গে ‘খোয়াবনামা’র কাহিনীটি বিকশিত করে তুলেছেন। (তৃণমূল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১)

১৭. লেখক জানিয়েছেন—

বই লেখার তাগিদে আমাদের বগুড়ার গ্রামে আমার খুব যেতে হয়। আর আমি তো গ্রামেরই লোক। বগুড়ার গ্রামগুলোতে আমি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি, ... পূজা-পার্বণে গ্রামের নিম্নবিত্তের মানুষের ধর্মনির্বিশেষে অংশগ্রহণ অনেক বেশি। বগুড়ার পোড়াদহে একটি মেলা হয়। সেই মেলার নাম হল সন্ন্যাসীর মেলা। সেই মেলায় একটা সন্ন্যাসীর মূর্তি তৈরি করা হয়। পরে সেটা পূজো করে বিসর্জন দেওয়া হয়। সেখানে সেটা কিন্তু একটা পারিবারিক-সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ নেয়। মেলা উপলক্ষে বাড়ির লোকদের আত্মীয়-স্বজনদের আনতে হবে, বিশেষ করে মেয়ে-জামাইকে আনতে হবে। তা না হলে সেই মেয়েদের পক্ষে শ্বশুরবাড়িতে থাকা মুশকিল হবে। এই মেয়ে নিয়ে আসছে, এটা কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সবাই। ... হিন্দু মুসলমানের কিছু কমন পারিবারিক বা সামাজিক উৎসব নেই। ওটা তো তাই,

হিন্দু-মুসলমানের কমন উৎসব। এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার না? আমি দেখছি বুড়ো নিম্নবর্ণের হিন্দু গরিব মানুষ আমায় বলেছে, দেখ তো, জামাইবাবাজী জীবনে আমার খোঁজ নেয় না, কিন্তু মেলার সময় সে ঠিক আসতে শুরু করেছে। এখন তাকে মেলা দেখার সব খরচ দিতে হবে। একই কথা গরিব মুসলমানের কাছেও শুনেছি, মাঘ মাসের শেষ বুধবার মেলাটা হয়। দুর্গাপূজা বা ঈদে ওখানে যে উৎসবটা হয়, তার থেকে অনেক বড় উৎসব হয় এই মেলা। এই জিনিসটা আমি আর কোথাও দেখিনি। ... শেরপুরের কাছে একটা জায়গা আছে কেল্লাতোষ। সেখানেও এই সন্ন্যাসীর মেলা হয়। ... জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরেও একই জিনিস হচ্ছে। এগুলো আমার মনে হয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়েছিল না আঠার শতকের শেষের দিকে, মজনুশাহ যে ফকির বিদ্রোহ করেছিল, আমার মনে হয় ওইসময় থেকে এই ব্যাপারগুলোর সূচনা হয়েছিল। আমার মনে হয় সন্ন্যাসীর মধ্যে ভবানী পাঠকও আছেন। হয়তো ভবানী সন্ন্যাসীও হতে পারে। এই জিনিসগুলো কিন্তু লেখকরা এড়িয়ে গেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ব্যাপারটা দেখতে গেলে অনেক নীচের দিকে যেতে হবে। একেবারে প্রলেতারিয়েত স্তরে; ... বাঙালি নিম্নবর্ণের নিম্নবিত্তের হিন্দু ও মুসলমানরা কিন্তু অনেক ব্যাপারটার অনেক কাছাকাছি আছেন। ... আরবি-ফারসি সংস্কৃতির যে ব্যাপারটা বলা হয়, সেটা কিন্তু ওপরের স্তরে। নীচের স্তরে সেটা নেই। (আলাউদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৪)

খ. কথাশিল্পী শওকত আলীর অভিমত -

খোয়াবনামার লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পৈতৃক নিবাস বগুড়া জেলা শহরে। তিনি লক্ষ্য করেন, মাঘ মাসের শেষদিকের বিশেষ একদিনে তাদের বাড়ির কাজের লোকেরা তাদের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠতো। দুটি কাজের মেয়ে তাদের বগুড়ার বাড়িতে কাজ করতো। তারা ওই পোড়াদহের মেলায় যাওয়ার জন্য মাত্র দুদিনের ছুটি পায়। অসুস্থ মায়ের কষ্ট হবে বলে তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হয়-কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কাজে আসে না। দুটি মেয়েই পালায়। এমনকি তার ঢাকার বাসায় মিনু নামে যে মেয়েটি কাজ করতো সেও পোড়াদহের মেলায় যেতে পারতো না বলে কাঁদতো। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, পোড়াদহের মেলায় কী আছে? তো জানা যায় যে, এই মেলা বসে একদিনের জন্য এবং সে মেলায় সন্ন্যাসীর থান আছে-ওই থানে পূজা দেয়া হয়-পূজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ নন-রাতের মধ্যেই মূর্তি স্থাপন, পরের দিন পূজা এবং যাবতীয় অনুষ্ঠান দিনে দিনেই শেষ করে দিতে হয়। আর অদ্ভুত কথা এই যে, চারদিকের গ্রামগুলোতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে মেয়ে জামাইকে নাইওর আনার রেওয়াজ আছে এবং খরচপত্র করার জন্য টাকাপয়সা জামাইয়ের হাতে দেয়া হয়-তা সে জামাইর বয়স যাই হোক। আরও জানা যায় যে, ওই মেলার আদিতে নাম ছিল সন্ন্যাসী মেলা। কাছাকাছি গ্রামের কাছে গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা- কেন এমন নাম? গিরি মানে তো পাহাড়, তো পাহাড় কোথায় ওই এলাকায়? ... জানা যায়, গিরি হচ্ছে পদবি। উত্তরে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি-ঠাকুগাঁও অঞ্চলে গেলে মানুষের নামের সঙ্গে এমন পদবি পাওয়া যায়। আরও অদ্ভুত সাদৃশ্যের

কথা এই যে, সন্ন্যাসীবিদ্রোহের নায়কদের অনেকেরই নামের সঙ্গেই পদবি ছিলো গিরি। (‘মীথ : তৃণমূলে যাবার এক পথ’, শওকত আলীর প্রবন্ধ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩৩-১৩৪)

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

- আনন্দ ভট্টাচার্য, (২০১০)। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ : ইতিহাসের পুনর্বিবেচনা, গাঙচিল, কলকাতা
- আনু মুহাম্মদ [সম্পা.], (১৯৮৮)। তৃণমূল, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা
- আবুবকর সিদ্দিক, (২০০১)। সাহিত্যের সংগ্ৰহসংগ, ঐতিহ্য, ঢাকা
- আলাউদ্দিন মণ্ডল [সম্পা.], (২০১১)। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : চূর্ণ ভাবনা ও চূর্ণ কথা সংগ্রহ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
- খালিকুজ্জামান ইলিয়াস [সম্পা.], ২০১২। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
- তপোধীর ভট্টাচার্য, (২০০৯)। উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, কলকাতা
- নাজমুল হক, (১৯৯৯)। পঞ্চগড় জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
- প্রণব সরকার [সম্পা.], (২০১৩)। লোক : বাংলার নদনদী, জলাশয় ১, কলকাতা
- মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান [সম্পা.], (২০০০)। ফিরে দেখা সারাজীবন ১, ঢাকা
- মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান [সম্পা.], (২০০১)। ফিরে দেখা সারাজীবন ২, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা
- মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ [সম্পা.], (২০১৪)। উষালোকে, নব পর্যায় অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, ঢাকা
- মোস্তফা মোহাম্মদ, (২০০৯)। সাহিত্যে মনন-সৃজন ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা
- রবিন পাল, (২০১১)। উপন্যাস : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এবং মুশায়েরা, কলকাতা
- শওকত আলী, (২০০৩)। শওকত আলীর প্রবন্ধ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা
- শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৯৯১)। গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য, প্যাপিরাস, কলকাতা
- সৌভিক রেজা, (২০১২)। কথাশিল্পের কথা, ধ্রুবপদ, ঢাকা
- হাসান আজিজুল হক, (২০০৫)। বাংলা কথাসাহিত্যে কয়েকজন : মগ্ন অবলোকন ও সামান্য বিচার, চারুলিপি, ঢাকা